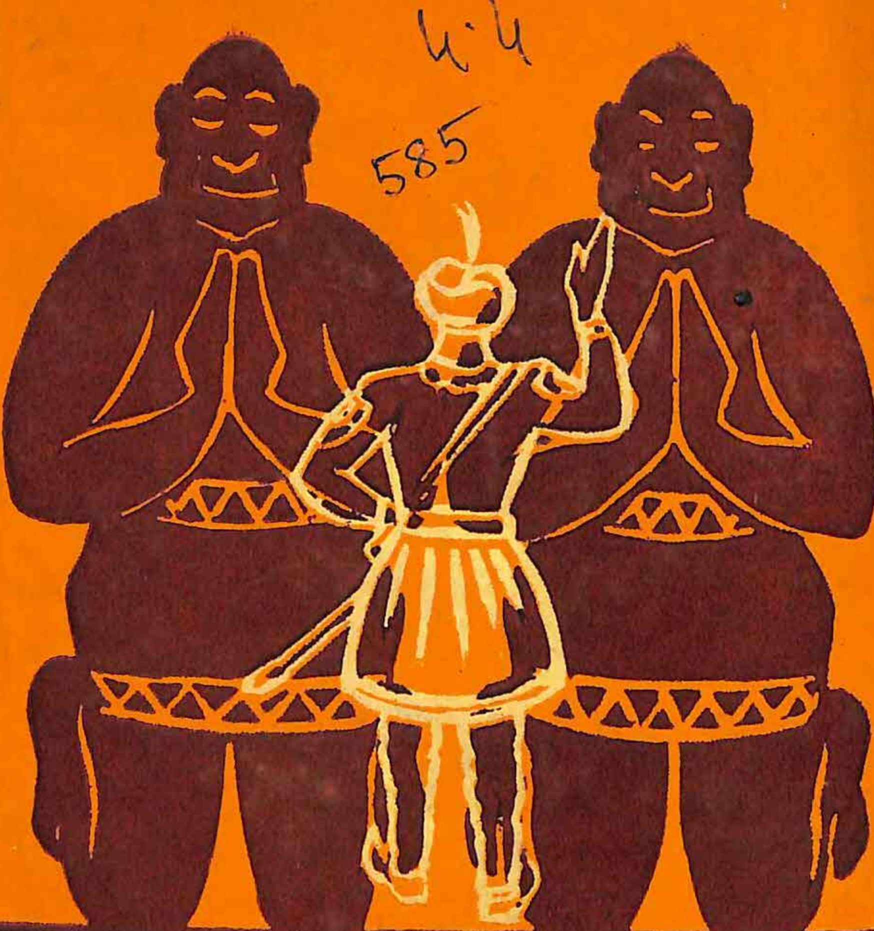


ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি

শ্রী কুলদা রঞ্জন রায়

ছেলেদের

বেতাল পঞ্চবিংশতি

কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Chheleder Betal

Panchabinsati

(Adaptation in Bengali from Sanskrit)

By Kuladaranjan Roy

(King of Juvenile Literature)

প্রকাশক :

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

পৌষ ১৩৯০ [ডিসেম্বর ১৯৮৩]

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :

শ্রীমন্মথনাথ পান

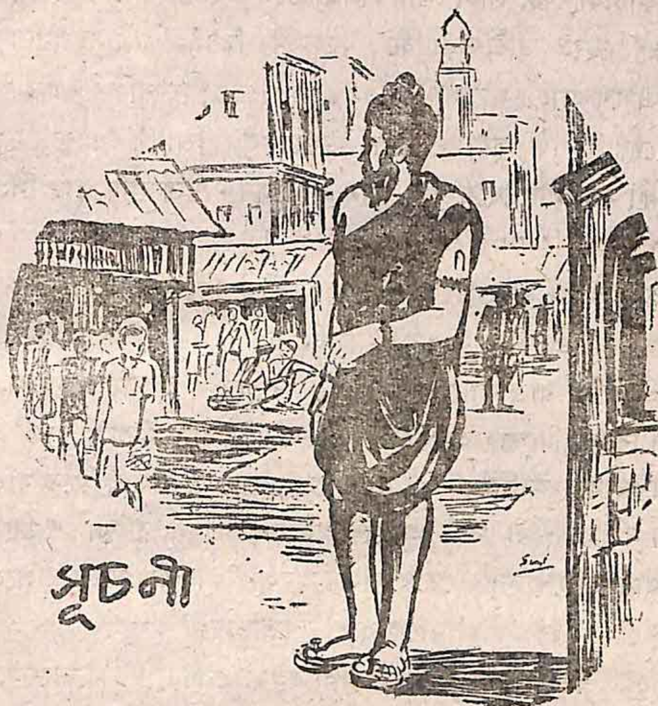
নবীন সরস্বতী প্রেস

১৭, ভীম ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

শিশুসাহিত্য-সম্রাট ৺কুলদারঞ্জন রায়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার লেখাগুলির জুড়ি নাই বলিলেই চলে। তাঁহার প্রত্যেকটি গল্প বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পদ। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই এই বইগুলি পড়া উচিত। উপহার দিবার পক্ষে এগুলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গল্পগুলি কিশোর-কিশোরীদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। পূর্বে আমরা কুলদারঞ্জন রায়-এর লেখা চারিখানি শ্রেষ্ঠ বই 'পুরাণের গল্প', 'কথাসরিৎসাগর', 'রবিন হুড্', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' পৃথক ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পর ঐগুলি 'কুলদা-কিশোর-গল্প-চতুষ্টয়' নামে প্রকাশ করি। কিশোর-কিশোরীদের সুবিধার জন্য এই খণ্ডগুলি পুনরায় চারিভাগে প্রকাশ করিলাম। আশা করি কুলদারঞ্জন রায়-এর স্মৃতিপূত এই গল্পগুলি বাংলার ঘরে ঘরে শোভা পাইবে।



সূচনা

উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্ব্বসেনের ছয় পুত্র ছিল। রাজকুমারদিগের সকলেই গুণবান্ ও সর্ব্ববিষয়ে বিশারদ ছিলেন। গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শঙ্কু রাজা হইলেন। শঙ্কুর যিনি ছোট, তাঁহার নাম ছিল বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য, কি না বিক্রমে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায়। তিনি কত বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা তাঁহার নামের অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। রাজা শঙ্কু, বিক্রমাদিত্যের ক্ষমতা প্রতিপত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিবার দন্ত নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে বিক্রমাদিত্যই তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন; এবং ক্রমে তিনি বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সুশাসনের গুণে সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইয়া দীর্ঘকাল পরম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য মনে করিলেন, প্রজারা কিরূপ ভাবে দিন কাটাইতেছে, তাহা তিনি নিজ চক্ষে দেখিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া, ছোট ভাই ভর্তৃহরিকে রাজ্যভার দিয়া, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুকাল পরে, স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে, ভর্তৃহরিও রাজ্যধন সমস্ত ছাড়িয়া একাকী সন্ন্যাসীর বেশে বনে গমন করিলেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল।

এই সংবাদ শ্রবণে, দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের রাজ্য রক্ষার জন্য এক যক্ষকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ভর্তৃহরির রাজ্যত্যাগের সংবাদ দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইলে, ক্রমে তাহা বিক্রমাদিত্যের কানেও পৌঁছিল। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলেন। মধ্যরাত্রে নগরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে প্রহরী যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া বলিল—"তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্? তোর নাম কি বল্।" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"তুই কে?—কিজন্য আমাকে বাধা দিতেছিস্?"

যক্ষ কহিল—"ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, তাই দেবরাজ ইন্দ্রের হুকুমে আমি এ নগর রক্ষা করিতেছি।"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ভর্তৃহরি আমারই ছোট ভাই। আমি এ রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য।"

এ কথায় যক্ষ বলিল—"তুমি যদি রাজা বিক্রমাদিত্য হও, তবে যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত কর—নতুবা কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।" রাজা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন দুইজনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যক্ষকে পরাজিত করিয়া, তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া, বুকে চড়িয়া বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল—"মহারাজ! আমি বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই রাজা বিক্রমাদিত্য। এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার প্রাণ বাঁচাইতেছি।"

ইহা শুনিয়া, রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আমি তোকে পরাজিত করিয়া, তোর বুকে চড়িয়া বসিয়াছি—ইচ্ছা করিলেই তোকে বধ করিতে পারি। আর তুই কিনা বলিতে ছস্, আমার প্রাণ বাঁচাইবি! তুই কি পাগল হইয়াছিস্?" যক্ষও হাসিয়া বলিল—"মহারাজ! আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি যাহা বলিব সেইরূপ কার্য্য করিলে, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরাপদে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া, বিক্রমাদিত্য সবিস্ময়ে যক্ষকে তখনই ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে বলিল—"মহারাজ! ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। একদিন তিনি শিকার করিতে গিয়া দেখিলেন, বনের মধ্যে এক তপস্বী, মাথা নীচের দিকে রাখিয়া, গাছে ঝুলিয়া ধুমপান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তপস্বী কাহারও সহিত কথা বলেন না; বহুকাল যাবৎ এই ভাবে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। রাজা নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন সভায় বসিয়া সকলকে এই যোগীর সংবাদ দিয়া বলিলেন—'যদি কেহ যোগীকে রাজধানীতে আনিতে পার, তবে লক্ষ স্থবর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার দিব।'

রাজবাড়ীর নিকটেই এক গরীব গৃহস্থ থাকিত; তাহার পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এক কন্যা ছিল। রজোর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সে একদিন রাজসভায় গিয়া বলিল—'মহারাজ! অনুমতি পাইলে আমি ঐ তপস্বীর তপোভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে পারি।' রাজা তখনই হুকুম দিলেন। কন্যাও সেই যোগীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে, সে যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল—সত্য সত্যই তিনি মাথা নীচের দিকে রাখিয়া, গাছে ঝুলিয়া ধুমপান করিতেছেন। তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার এবং চক্ষু মুদ্রিত। বুদ্ধিমতী কন্যা বুঝিতে পারিল, যোগীর এই কঠোর ধ্যান

হঠাৎ ভঙ্গ করা অসম্ভব। তখন সে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, এক উপায় স্থির করিল। নিকটেই একখানি সুন্দর কুটীর প্রস্তুত করাইয়া, যোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিল। প্রতিদিন মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া অল্প অল্প করিয়া যোগীর মুখে দেয়, যোগী তাহা ভক্ষণ করেন। এইরূপে কিছুদিন মোহনভোগ খাইয়া যোগীর শরীরে বল ফিরিয়া আসিল, এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি তখন চক্ষু মেলিয়া সেই কন্যাকে দেখিতে পাইয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? একাকী এই নির্জ্জন বনে কেন আসিয়াছ?'

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া কন্যা বলিল—'প্রভু! আমি দেবকন্যা। তপস্যার জন্য এই বনে আসিয়া নিকটেই বাস করিতেছি। ভাগ্যক্রমে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, আমি ধন্য হইলাম।' তপস্বী কহিলেন—'সুন্দরি! আমি তোমাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ভদ্রতায় ও সেবায় পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার আশ্রম দেখিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। আপত্তি না থাকিলে আমাকে সেখানে লইয়া চল।'

কন্যা যোগীকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া, পরম যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। যোগী তাহার সেবা যত্নে ও মিষ্ট স্বভাবে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার সহিত সুখে সংসারবাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। এইরূপে সন্ন্যাসী ক্রমে ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

কিছুকাল পরে, একদিন কন্যা বলিল—'প্রভু! এতদিন আমরা শুধু সংসারের সুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলাম; এখন তীর্থযাত্রা করিয়া কিছু পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত।' এইরূপে যোগীকে ফাঁকি দিয়া এবং পুত্রকে তাঁহার কাঁধে চড়াইয়া, কন্যা তাঁহাকে চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। রাজসভার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া এবং সন্ন্যাসীর কাঁধে পুত্র দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিলেন—

'দেখ, দেখ! সেই কন্যা তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমি ইহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি!'

রাজার এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসার হঠাৎ চৈতন্য হইল। তখন নিজের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাজা চন্দ্রভানুই তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়া



…যোগীকে ফাঁকি দিয়া…চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল

এই কন্যাকে পাঠাইয়াছিলেন! রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন পুত্রকে মাটিতে ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর, পুনরায় বনে গিয়া অধিকতর নিষ্ঠার সহিত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া, তিনি রাজা চন্দ্রভানুকে বধ করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিলেন না।"

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া যক্ষ পুনরায় বলিল—"মহারাজ! তুমি, রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী, এই তিনজন এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তুমি রাজা হইয়া পৃথিবী পালন করিতেছ। চন্দ্রভানু তেলির ঘরে জন্মিয়াও কপালগুণে ভোগবতী নগরের রাজা হইয়াছিল। আর যোগী কুমার হইয়াও যোগবলে চন্দ্রভানুকে বধ করিয়াছে এবং তাহাকে বেতাল করিয়া এক শশ্মানে শিরীষ গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এখন সে তোমাকেও বধ করিবার চেষ্টায় আছে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এখন তুমি যদি তাহার হাত হইতে নিস্তার পাও, তবেই চিরজীবন পরমসুখে রাজত্ব করিতে পারিবে। মহারাজ! এসব কথা ত আর তুমি জানিতে না, সুতরাং তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইলাম।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া যক্ষ চলিয়া গেল। রাজাও মহা বিস্মিত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া রাজবাড়ীতে মহা আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল।

কিছুদিন পরে, রাজসভায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া বিক্রমাদিত্যের হাতে একটি বেল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলে, রাজা মনে মনে ভাবিলেন—"যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছিল, এ বোধ হয় সেই লোক। যাহা হউক, এই বেল হঠাৎ খাওয়াটা উচিত হইবে না।" ইহা ভাবিয়া, বিক্রমাদিত্য ফলটি কোষাধ্যক্ষকে রাখিয়া দিতে বলিলেন। তখন হইতে সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং একটি করিয়া বেল দিয়া যান।

একদিন রাজা বন্ধুদিগের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া পূর্বের ন্যায় বেল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হাত পাতিয়া বেলটি লইবার সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া

যাওয়াতে তাহার ভিতর হইতে একটি অদ্ভুত রত্ন বাহির হইল। রত্নটি এতই উজ্জ্বল যে, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন! তখন রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কেন আমাকে এরূপ মহামূল্য রত্ন দিলেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"মহারাজ! শাস্ত্রে আছে—রাজার নিকট শূন্য হাতে যাইতে নাই, এইজন্য আমি রত্নগর্ভ বেল লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। শুধু এই বেলটির মধ্যেই রত্ন আছে, এরূপ মনে করিবেন না। এপর্য্যন্ত আপনাকে যতগুলি বেল দিয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করিয়া এইরূপ রত্ন পাইবেন।" রাজা তখন ফিরিয়া আসিয়া কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমাকে যতগুলি বেল রাখিতে দিয়াছি, সমস্ত লইয়া আইস।" রাজাজ্ঞায় কোষাধ্যক্ষ সমস্ত বেল আনিয়া, উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক বেল ভাঙ্গিয়া, তাহার ভিতরে এক একটি রত্ন দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তারপর সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি যোগী হইয়া এতগুলি অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন এবং আমাকেই বা সেগুলি দিবার কারণ কি? আপনার যদি বিশেষ কোন অভিপ্রায় থাকে, বলুন—আমি নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব।"

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি গোদাবরী তীরে এক শ্মশানে মন্ত্রসাধন করিব, তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। সেজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, একদিন তুমি সন্ধ্যার সময় আমার নিকট গিয়া সকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। তুমি আমার নিকটে থাকিলেই আমার সিদ্ধিলাভ হইবে।" রাজা বলিলেন—"আমি নিশ্চয়ই যাইব। কবে যাইতে হইবে বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আগামী ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে সন্ধ্যার সময় আমার কুটীরে যাইবে।" রাজা সম্মত হইলেন, সন্ন্যাসীও চলিয়া গেলেন।

ক্রমে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইলে, বিক্রমাদিত্য একখানি তলোয়ার সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, যোগী শ্মশানে যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে অসংখ্য ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সন্ন্যাসী নিজে দুই হাতে মড়ার মাথা লইয়া বাদ্য করিতেছেন। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া রাজা একটুও ভয় পাইলেন না। সন্ন্যাসীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমি আসিয়াছি, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।" যোগী কহিলেন - "মহারাজ! সাধু লোকেরা চিরদিন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। তোমার কথা মত তুমি যে আমার আশ্রমে আসিয়াছ, তাহাতে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—এখান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে গেলে এক শ্মশান দেখিতে পাইবে। সেই শ্মশানে দেখিবে একটা শিরীষ গাছে শব ঝুলিতেছে। ঐ শব আমার নিকট লইয়া আইস।" শব অনিবার জন্য রাজা তখনই প্রস্থান করিলেন।



সন্ন্যাসী রাজাকে আড়ালে লইয়া বলিতেছেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি, চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার; তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভূত-প্রেতেরও ভীষণ কোলাহল! কিন্তু রাজা বিন্দুমাত্রও ভয় না পাইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে ভূতের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। তাহাতেও বিচলিত না হইয়া শেষে তিনি শ্মশানে গিয়া

উপস্থিত হইলেন। রাজা চারিদিক্ খুঁজিয়া অবশেষে সেই শিরীষ গাছের নিকটে গিয়া দেখিলেন, সমস্ত গাছটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে! আর চারিদিকে কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দ!

ইহা দেখিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন —যক্ষ যে যোগীর কথা বলিয়াছিল, এ ব্যক্তি সেই, তাহাতে কোনও



সন্ন্যাসী ছুই হাতে মড়ার মাথা লইয়া বাদ্য করিতেছেন।

সন্দেহ নাই। তারপর গাছের নিকটে গিয়া দেখিলেন, সেই শব মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলান রহিয়াছে। রাজা গাছে, উঠিয়া, তলোয়ার দিয়া শবের বাঁধনের দড়ি কাটিয়া দিলেন। শব মাটিতে পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শবের ক্রন্দন শুনিয়া রাজা নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাছ হইতে নামিয়া, উহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তোমার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে? শব খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল! রাজা অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে শব পুনরায় গাছে উঠিয়া ঝুলিয়া রহিল! রাজাও তৎক্ষণাৎ গাছে উঠিয়া পুনরায় দড়ি কাটিলেন বটে,

কিন্তু এবারে শবটাকে ফেলিয়া না দিয়া, হাতে চাপিয়া ধরিয়া নামিয়া আসিলেন। তারপর, কত রকমে মিনতি করিয়া তিনি তাহার দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন—যক্ষের নিকট যে তেলির কথা শুনিয়াছিলাম, এ শব তাহারই। আর এই যোগীও সেই কুমার; যোগসিদ্ধির জন্য তেলিকে বধ করিয়া শ্মশানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! তখন তিনি শবটাকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্দ্ধেক পথ আসিলে শবের ভূত বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে বীরপুরুষ! তুমি কে? আমাকে কোথায় এবং কিজন্য লইয়া যাইতেছ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামক যোগীর কথায় তোমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি।" তখন বেতাল বলিল—"মহারাজ! মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকেরা ঘুমাইয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত লোকেরা সর্ব্বদা শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকার্য্য করিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথটা চুপ্ করিয়া না গিয়া, আমি কয়েকটি গল্প বলিতেছি, শুন। প্রত্যেক গল্প শেষ করিয়া তোমাকে প্রশ্ন করিব। যদি তাহার ঠিক উত্তর দাও, তবে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব। আর যদি জানিয়া শুনিয়া ঠিক উত্তর না দাও, তবে তখনই তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে।" বেতালের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, শব লইয়া রাজা যোগীর আশ্রমে চলিলেন। বেতালও পথে যাইতে যাইতে গল্প আরম্ভ করিল।



বেতাল বলিল—"মহারাজ ! শুন—

বারাণসী নগরে মহা ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন ; তাঁহার নাম ছিল প্রতাপমুকুট। রাজার রাণীর নাম মহাদেবী এবং পুত্রের নাম ছিল বজ্রমুকুট। রাজকুমার বজ্রমুকুট মন্ত্রীপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীপুত্রের সহিত শিকার করিতে গেলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, ক্রমে তাঁহারা একটি সুন্দর পুকুর দেখিতে পাইলেন। নিকটেই একটি বকুল গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া রাজপুত্র সেই পুকুরের জলে স্নান করিলেন। পুকুরের পাড়ে মহাদেবের মন্দির ছিল। স্নানের পর রাজকুমার মহাদেবের মন্দিরে পূজা করিয়া, কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। সেই সময়ে এক পরম-সুন্দরী রাজকন্যাও সহচরীদিগের সহিত পুকুরের অপর

পারে আসিয়া স্নান ও পূজা শেষ করিয়া গাছের ছায়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। রাজকন্যাকে দেখিয়া বজ্রমুকুটের মন মুগ্ধ হইল। রাজকন্যাও তাঁহাকে দেখিয়া মাথার পদ্মফুলটি হাতে লইয়া, প্রথমে কানে লাগাইলেন ; তারপর দাঁত দিয়া ফুলটিকে কাটিয়া পায়ের



বজ্রমুকুট রাজকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

তলায় ফেলিলেন। পরে পুনরায় ফুলটি তুলিয়া লইয়া বুকে রাখিয়া, বার বার রাজকুমারকে দেখিতে দেখিতে সহচরীদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন।

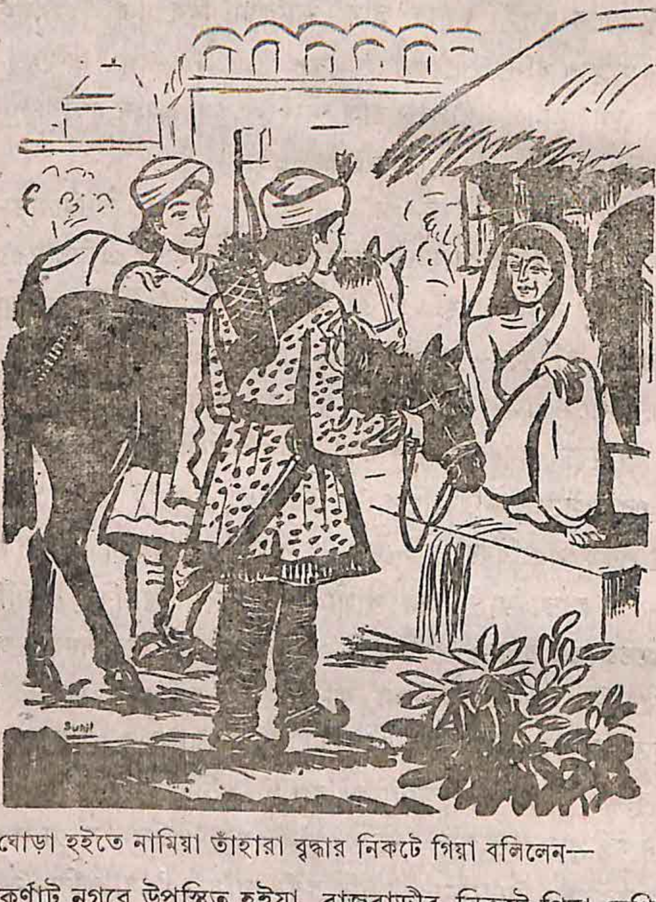
রাজকুমারী চলিয়া গেলে, বজ্রমুকুট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীপুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন—'বন্ধু! এই-

মাত্র আমি পরমাসুন্দরী এক কন্যা দেখিয়াছি—তাহার নাম, ধাম কিছুই জানি না ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তাহাকে বিবাহ করিব, না হয় জীবন বিসর্জ্জন দিব।' এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র তাঁহাকে লইয়া তখনই ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন হইতে রাজপুত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাকী নির্জ্জনে মলিন মুখে বসিয়া থাকেন ; কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলেন না। অবশেষে, তিনি নিজ হাতে সেই কন্যার ছবি আঁকিয়া দিনরাত্রি কেবলই সেই ছবির সম্মুখে বসিয়া থাকেন ; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেন না। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে কত রকমে বুঝাইলেন, কত তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

প্রিয় বন্ধুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র ভাবিলেন—'ইনি দেখিতেছি নিতান্তই পাগল হইয়াছেন। এখন ইহার প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করা আবশ্যক।' এই ভাবিয়া, একদিন তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা বন্ধু! সেই কন্যা চলিয়া যাইবার সময় কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল ?' রাজকুমার বলিলেন—'না বন্ধু! কন্যা যাইবার সময় আমাকে কোন কথাই বলে নাই। তবে কিনা, কি একটি সঙ্কেত করিয়াছিল।' এই কথা বলিয়া, তিনি মন্ত্রীপুত্রকে সেই পদ্মফুলের বিষয় বলিলেন। পদ্মফুলের বিবরণ শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'আর চিন্তা কি! আমি সেই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। কন্যার নাম, ধাম সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিলাম, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব।' ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—'যদি সব বুঝিয়া থাক, শীঘ্র আমাকে বল। শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হই।' তখন মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! শুন—কন্যা পদ্মফুল কানে লাগাইয়া, তোমাকে জানাইয়াছেন—'আমি কর্ণাটবাসিনী।' দাঁত দিয়া ফুলটাকে কাটিয়া বলিয়াছেন—'আমি দন্তবাট রাজার কন্যা।' তারপর, ফুলটাকে পায়ের তলায় ফেলিয়া বলিয়াছেন—'আমার নাম পদ্মাবতী।' আর

বুকে রাখিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছেন—'তোমার কথা আমার মনে থাকিবে।'

বন্ধুর এই কথা শুনিয়া, রাজকুমারের আহ্লাদের সীমাই রহিল না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—'আমাকে শীঘ্র কর্ণাট নগরে লইয়া চল।' তখন কালবিলম্ব না করিয়া, উভয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদিন



······ ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহারা বৃদ্ধার নিকটে গিয়া বলিলেন—

পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া, রাজবাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা তাহার ঘরের দরজায় বসিয়া আছে।

ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহারা বৃদ্ধার নিকটে গিয়া বলিলেন—'মা,

আমরা বিদেশী বণিক্ ; বাণিজ্যের জন্য এখানে আসিয়াছি। দয়া করিয়া তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও।' বৃদ্ধা তাঁহাদের সুন্দর আকৃতি দেখিয়া এবং মিষ্ট কথাবার্ত্তায় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল— 'বাবা! এটা তোমাদেরই বাড়ী, যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার।' রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র এইরূপে বৃদ্ধার বাড়ীতে স্থান পাইলেন। কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধা তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তোমাদের পরিবারে তোমরা কয়জন আছ? কি করিয়া তোমাদের সংসার চলে?' বৃদ্ধা বলিল —বাবা! আমরা দুটি প্রাণী—আমি আর আমার পুত্র। পুত্র রাজ-বড়ীতে কাজ করে, রাজা তাহাকে বড় ভালবাসেন। আমি পূর্ব্বে রাজকুমারী পদ্মাবতীর ধাত্রী ছিলাম। এখন বুড়া হইয়াছি, ঘরেই থাকি। রাজা দয়া করিয়া খাইতে পরিতে দেন। আর রাজকন্যা আমাকে বড় ভালবাসেন, তাই রোজ একবার তাঁহাকে দেখিতে যাই।'

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—'কাল যখন রাজকুমারীর কাছে যাইবে, আমাকে বলিও- আমি তাঁহার নিকট কটি সংবাদ পাঠাইব।' বৃদ্ধা বলিল—'যদি বিশেষ আবশ্যক থাকে বল, আমি এখনই রাজ-কন্যাকে জানাইয়া আসি।' এ কথায় রাজকুমার নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'রাজকুমারীকে বলিও—পুকুরের ধারে যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে সে তোমার সঙ্কেত মত এখানে আছিয়াছে।'

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা রাজবাড়ীতে গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল কন্যা নির্জ্জনে একাকী বসিয়া আছেন। তখন সে বলিল —'বাছা! ছেলেবেলায় কত যত্নে তোমাকে মানুষ করিয়াছি। এখন ভগবানের কৃপায় বড় হইয়াছ। আমার একান্ত ইচ্ছা, শীঘ্র উপযুক্ত পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ হয়। শুক্ল পঞ্চমীতে, এক পুকুরের ধারে, তুমি যে রাজকুমারকে দেখিয়া পদ্মফুল দিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলে তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমি বলি, এই রাজকুমারই

তোমার উপযুক্ত পাত্র। তোমার যেমন রূপ ও গুণ, তাঁহারও ঠিক তেমনই।'

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকন্যা, হাতে চন্দন মাখাইয়া বৃদ্ধার দুই গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্তঃপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া বৃদ্ধা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজকুমারকে সব কথা বলিল। তাহা শুনিয়া রাজকুমার নিতান্ত নিরাশ হইয়া বন্ধুকে বলিলেন—'হায়, হায়! এখন কি করি? রাজকুমারী নিশ্চয় আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, নতুবা আমার দূতীকে এরূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবেন কেন?' মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! না বুঝিয়া এত ব্যস্ত হও কেন? হাতে চন্দন মাখিয়া দুই গালে দুইটি চড় মারাতে বৃদ্ধার গালে দশটি আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে। তাহার অর্থ এই—শুক্লপক্ষের আর দশ দিন অবশিষ্ট আছে। তারপর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে তোমার সহিত রাজকুমারীর দেখা হইবে।'

কৃষ্ণপক্ষ আসিল। বৃদ্ধা পুনরায় রাজকুমারীর নিকট গিয়া রাজকুমারের কথা বলিলে তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া অন্তঃপুরের খিড়্‌কী দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তখনই ফিরিয়া গিয়া রাজকুমারকে সব কথা বলিল। তিনি শুনিয়া পুনরায় বিষণ্ণ হইলেন দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'বন্ধু! চিন্তা করিও না, এবারে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আজ রাত্রে সেই খিড়্‌কী দরজার নিকট যাইবার জন্য রাজকন্যা তোমাকে আদেশ করিয়াছেন।' রাজকুমার মহা সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাজকুমার বিবাহযোগ্য বেশ করিয়া অন্তঃপুরের খিড়্‌কী দরজায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীও বিবাহের সাজে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন রাজকুমার সখীদিগকে সাক্ষী করিয়া গন্ধর্ব্বমতে মালা বদল করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। আর কেহ তাহা

জানিতে পারিল না। বিবাহের পর রাজকুমারীর অনুরোধে তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইতে হইল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে চাহিলে রাজকুমারী বলিলেন—'আমার অন্তঃপুরে সখীগণ ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, তুমি নির্ভয়ে এখানে থাক।' এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজকুমার অন্তঃপুরে পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে রাজকুমার দেশে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ক্রমে একমাস কাটিয়া গেল, তবু রাজকুমার ফিরিবার অনুমতি পাইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া একদিন নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি নিতান্ত নরাধম! সামান্য সুখের জন্য পিতা, মাতা, জন্মভূমি সব ছাড়িলাম! একমাস যাবৎ প্রিয় বন্ধুর কোন সংবাদ লইলাম না! না জানি বন্ধু আমাকে কত অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর মনে করিতেছেন!'

রাজকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজকন্যা হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তুমি কি চিন্তা করিতেছ বল।' বজ্রমুকুট বলিলেন—'একমাস যাবৎ আমার বন্ধুর কোন সংবাদ জানি না। না জানি তিনি কেমন আছেন!'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিলেন—'বন্ধুকে না দেখিয়া মনে যে কষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এতদিন তাঁহার সংবাদ না লইয়া তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ। এখন তাঁহার সন্তোষের জন্য আমি নিজ হাতে নানা রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইব। তুমিও একবার গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আইস।' রাজকুমার তৎক্ষণাৎ খিড়্‌কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া, বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত! অনেকদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া আহ্লাদে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

এদিকে রাজপুত্রকে বিদায় দিয়া পদ্মাবতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'রাজকুমার নিশ্চয়ই বন্ধুর নিকট সব কথা বলিবেন। মন্ত্রীপুত্রও আমাদের বিবাহের কথা সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইবে। যাঁহারা গুরুজন, তাঁহাদের অমতে বিবাহ করিয়াছি জানিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন এবং সকলে আমার নিন্দা করিবে। অতএব মন্ত্রীপুত্রকে জীবিত রাখা কিছুতেই উচিত হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজকন্যা বিষ মিশাইয়া নানা রকম খাবার প্রস্তুত করিলেন এবং সখীকে দিয়া রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু! এসব খাবার কোথা হইতে আসিল?' তখন রাজকুমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'বন্ধু! রাজকন্যা নিজহাতে তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি কিছু খাও। তাহা হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব এবং তাঁহাকে গিয়া বলিব—আমার বন্ধু মিষ্টান্ন খাইয়া তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া, মন্ত্রীপুত্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—'বন্ধু! এ মিষ্টান্ন নয়, তুমি আমার জন্য বিষ আনিয়াছ! নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তুমি ইহা খাও নাই।' রাজকুমার বলিলেন—'বন্ধু! রাজকন্যা মিষ্টান্ন বলিয়া তোমার জন্য বিষ পাঠাইবেন এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না! তুমি না জানিয়া মিছামিছি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেছ! যাহা হউক, আমি এখনই তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া রাজকুমার কিছু মিষ্টান্ন লইয়া একটা বিড়ালকে খাইতে দিলেন। তাহা খাইবামাত্র বিড়ালটা মরিয়া গেল! এই ব্যাপার দেখিয়া রাজকুমারের চক্ষুস্থির! তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'এরূপ রাক্ষসীর মুখ দেখিলেও পাপ! তাহার সহিত আর কোন সংস্রব রাখিব না!' মন্ত্রীপুত্র বলিলেন—'না বন্ধু! তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে

চলিবে না ! বুদ্ধি করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবে। তুমি এক কাজ কর—ফিরিয়া গিয়া রাজকন্যাকে বল যে, মিষ্টান্ন খাইয়া বন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে অনেকক্ষণ তোমাকে না দেখিয়া আমি কিছুতেই আর থাকিতে পারিলাম না ; সেজন্য চলিয়া আসিয়াছি। তারপর রাত্রে যখন রাজকন্যা ঘুমাইবেন তখন তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া চলিয়া আসিও।' রাজকুমার সম্মত হইয়া পদ্মাবতীর নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাত্রিতে



নগরপাল আসিয়া দুইজনকেই ধরিল

রাজকন্যা ঘুমাইলে তিনি মন্ত্রীপুত্রের উপদেশমত সমস্ত কাজ শেষ করিয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে, মন্ত্রীপুত্র সন্ন্যাসীর বেশে এক শ্মশানে গিয়া নিজে গুরু সাজিলেন, আর রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া বলিলেন—'বন্ধু ! তুমি

সহরে গিয়া এই অলংকারগুলি বিক্রয় কর। যদি কেহ চোর বলিয়া তোমাকে ধরে, তবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

মন্ত্রীপুত্রের উপদেশমত রাজকুমার অলঙ্কার লইয়া নগরে চলিলেন। রাজবাড়ীর নিকটেই এক সেকরার দোকান ছিল, তিনি সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলঙ্কারগুলি এই সেকরাই প্রস্তুত করিয়াছিল। সুতরাং সেগুলি দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল যে, রাজ কুমারীর অলঙ্কার। তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল —'রাজকুমারীর অলঙ্কার এ লোকের হাতে কি করিয়া আসিল! লোকটা দেখিতেছি বিদেশী। তবে কি এ অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছে!' এইরূপ চিন্তা করিয়া, সে জিজ্ঞাসা করিল—'এ অলঙ্কার তুমি কোথায় পাইলে? এ যে রাজকন্যার অলঙ্কার! নিশ্চয় তুমি চুরি করিয়াছ!' কথায় কথায় গোলমাল বাধিয়া গেলে অনেক লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ক্রমে এই সংবাদ পাইবামাত্র নগরপাল আসিয়া দুইজনকেই ধরিল। তখন অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাজকুমার বলিলেন—'আমার গুরুদেব শ্মশানে থাকেন; তিনিই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তিনি এগুলি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছু জানি না।' তখন নগরপাল রাজপুত্রের সহিত শ্মশানে গিয়া গুরুশিষ্য দুইজনকেই ধরিল এবং অলঙ্কারের সহিত তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইল।

অলঙ্কার দেখিয়া রাজা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন এবং যোগীকে নির্জনে লইয়া গিয়া নিতান্ত বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়! সত্য করিয়া বলুন, আপনি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?' যোগী বলিলেন—'মহারাজ! আমি ডাকিনীমন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। ডাকিনী নিজে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ স্বরূপ তাঁহার এই অলঙ্কারগুলি আমাকে দিয়াছেন। আমিও সিদ্ধি-লাভের প্রমাণস্বরূপ, তাঁহার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছি।'

এ কথায় রাজা বিস্মিত মনে অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে বলিলেন—'দেখ দেখি, রাজকন্যার বাঁ পায়ে চিহ্ন দেখিতে পাও কিনা ?' রাণী দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—'হাঁ, ত্রিশূলের কোন চিহ্ন আছে !' তখন লজ্জায়



......পদ্মাবতী গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছেন

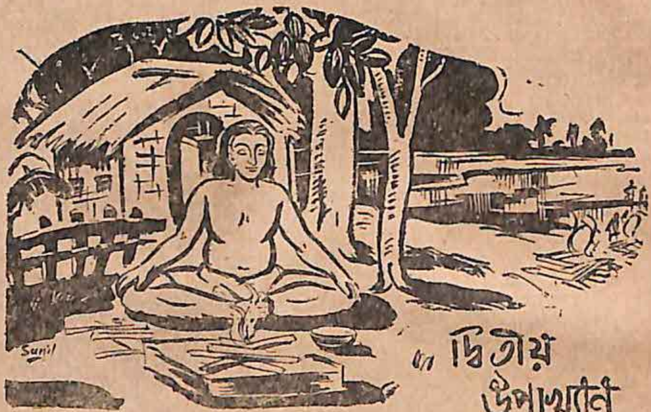
মাথা নীচু করিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন—'কি সর্ব্বনাশ, পদ্মাবতী ডাকিনী ! গোপনে শ্মশানে যায়, আমার মান-অপমানের কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না ! এমন ডাকিনী মেয়েকে কখনই বাড়ীতে

রাখা উচিত নয়। ইহাতে আমার অধর্ম্ম হইবে—রাজপরিবারের দুর্নাম হইবে! এখন কর্ত্তব্য কি?' অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা স্থির করিলেন—সন্ন্যাসীকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'মহারাজ! শাস্ত্রে লেখা আছে, স্ত্রীলোক গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে বধ করিতে নাই। রাজা তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবেন।'

তখন রাজা, রাণীকে বুঝাইয়া তাঁহার মত লইয়া পদ্মাবতীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজার আদেশে রাজকুমারীকে পাল্কীতে চড়াইয়া বাহকেরা এক গভীর বনের মধ্যে রাখিয়া আসিল। এদিকে মন্ত্রীপুত্রও রাজকুমারকে লইয়া রাজকন্যার উদ্দেশে চলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সেই বনে গিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী একা গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। তখন দুইজনে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার শোক দূর করিলেন। পরে তাঁহাকে লইয়া উভয়ে স্বদেশে যাত্রা করিতে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজা প্রতাপমুকুট অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্র ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজবাড়ীতে মহোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বিনা দোষে রাজকুমারীর নির্ব্বাসনের জন্য রাজা ও মন্ত্রীপুত্রের মধ্যে কে অপরাধী?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন, "আমার মতে রাজা।" বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?" রাজা বলিলেন—"শাস্ত্রে লেখা আছে, শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্রকে মারিবার জন্য রাজকন্যা মিষ্টান্নে বিষ মিশাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি মন্ত্রীপুত্রের এরূপ আচরণে কোন দোষ হয় নাই। কিন্তু রাজা একজন অজ্ঞাতকুল-শীল বিদেশী লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোনরূপ সন্ধান করিলেন না; কন্যার প্রতি স্নেহ মমতা সব ভুলিয়া, বিনা দোষে তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন—ইহাতে রাজধর্ম্মের বিপরীত কাজ

করা হইয়াছে এবং সেজন্য তাঁহার পাপও হইতে পারে।” ইহা শুনিয়া বেতাল তাহার প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় শিরীষ গাছে ঝুলিয়া রহিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া গাছ হইতে তাহাকে নামাইলেন এবং কাঁধে করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসীর আশ্রমে চলিলেন।



দ্বিতীয় উপাখ্যান

পথে যাইতে যাইতে বেতাল বলিল—"মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর—

যমুমাতীরে জয়স্থল নামক নগরে পরম ধার্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার নাম কেশব। ঐ ব্রাহ্মণের মধুমালতী নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। কন্যা বড় হইলে তাহার বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে এক বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণকে অন্য গ্রামে যাইতে হইল। ব্রাহ্মণকুমারও বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় ত্রিবিক্রম নামে পরম রূপবান এক ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বাড়ীতে অতিথি হইল। কেশবের ব্রাহ্মণী তাহার সৌন্দর্য্য ও বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন—'যদি এই বালক উত্তম কুলে জন্মিয়া থাকে এবং বিবাহ করিতে স্বীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা করিব!' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে পরম যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন সে উত্তম বংশের সন্তান। তখন ব্রাহ্মণীর অত্যন্ত আহ্লাদ হইল; তিনি বলিলেন—'বাছা! তুমি যদি সম্মত হও,

তবে আমার মধুমালতীকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দেই!' ত্রিবিক্রম মধুমালতীকে পূর্ব্বেই দেখিয়াছিল, সুতরাং সে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় সেখানে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কেশব ও তাঁহার পুত্র দুই জনেই এক এক বর লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিবিক্রম, বামন আর মধুসূদন, এই তিন বর একত্র হইল। রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তিন জনই সমান, কেহ কম নয়! ব্রাহ্মণ মহা মুস্কিলে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন —'এক কন্যা, আর পাত্র তিন জন! তিন জনকেই কথা দেওয়া হইয়াছে—এখন উপায় কি?'

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? এদিকে যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মধুমালতীকে সাপে কামড়াইয়াছে।' ব্রাহ্মণ মহা ব্যস্ত হইয়া, তখনই বিষ-বৈদ্য ডাকিয়া কত রকমে চিকিৎসা করাইলেন কিন্তু কোনই ফল হইল না—মধুমালতীর মৃত্যু হইল। তখন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পুত্র এবং তিন বর, এই পাঁচজনে মিলিয়া, মধুমালতীর সৎকার করিলেন। এই নিদারুণ ঘটনায় তিন পাত্রের মনেই বিরাগ জন্মিল। ত্রিবিক্রম চিতা হইতে কন্যার অস্থি লইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। আর মধুসূদন শশ্মানের এক কোণে ঘর বাঁধিয়া এবং তাহাতে মধুমালতীর ভস্ম রাখিয়া যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বামন ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত! বাড়ীতে মধ্যাহ্নের আহার একেবারে প্রস্তুত, এমন সময় অতিথি আসিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—'মহাশয়! যদি অনুগ্রহ করিয়া গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়েছেন, তবে দুটি আহার করুন—রান্না প্রস্তুত।' সন্ন্যাসী বামন সম্মত হইয়া ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে

ব্রাহ্মণের পাঁচ বৎসরের শিশুটি আসিয়া বড় উৎপাত আরম্ভ করিল; ব্রাহ্মণী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। শিশুকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অশান্ত বালক কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তখন ব্রাহ্মণী রাগিয়া শিশুকে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

এই অমানুষিক কাণ্ড দেখিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ আহারে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—'মহাশয়! হঠাৎ আহার বন্ধ করিলেন কেন?' সন্ন্যাসী বলিলেন—'এরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিলে কি আহার করিতে ইচ্ছা হয়?' ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া ঘরের ভিতর হইতে সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুস্তক আনিয়া এক মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শিশু পুনরায় জীবিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎপাত আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া আহার শেষ করিলেন। তারপর তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'এই পুস্তকে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, এই মন্ত্র শিখিতে পারিলে মধুমালতীকে বাঁচাইতে পারিব। অতএব যেরূপে হউক এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে হইবে।'

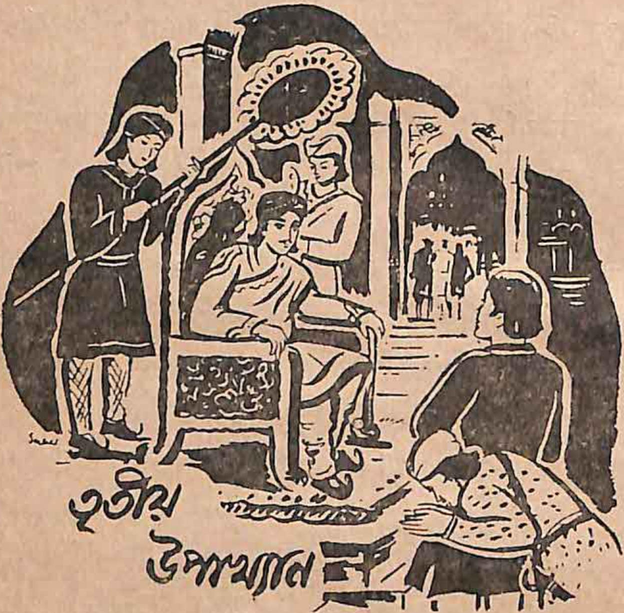
এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে বলিলেন 'মহাশয়! বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এ সময়ে আর কোথায় যাই? অনুগ্রহ করিয়া আপনার বাড়ীতে রাত্রিটা কাটাইতে দিন।' ব্রাহ্মণ মহা সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাত্রিতে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন সন্ন্যাসী চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তকখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে, মধুমালতী শ্মশানে গিয়া দেখিলেন, মধুসূদন কুটীরে বসিয়া যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবাৎ ত্রিবিক্রমও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বামন বলিলেন—'আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি। তোমরা মধুমালতীর অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি তাহাকে বাঁচাইব।' ত্রিবিক্রম অস্থি ও মধুসূদন ভস্ম একত্র করিলে বামন পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করিয়া

মধুমালতীকে জীবিত করিলেন। তখন তিনজনেই মধুমালতীকে বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।”

ইহা বলিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ! এই তিনজনের মধ্যে কে মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে?” বিক্রমাদিত্য বলিলেন—“শ্মশানে ঘর বাঁধিয়া যে বাস করিয়াছিল, আমার মতে সেই ব্যক্তি এই কন্যাকে বিবাহ করিবার অধিকারী। কারণ পুত্রই পিতামাতার অস্থি রক্ষা করে। সুতরাং ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয় করিয়া মধুমালতীর পুত্রের মত হইয়াছে। আর বামন জীবন দান করিয়া তাহার পিতার তুল্য হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন ভস্ম লইয়া শ্মশানে বাস করিয়া বিবাহের অধিকারী হইয়াছে। অতএব, সে-ই মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে।”

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞা মত ইত্যাদি—



বেতাল তৃতীয় গল্প আরম্ভ করিল—

"মহারাজ! বর্দ্ধমান নগরে অতিশয় বিদ্বান্, গুণবান্ ও পরম ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম রূপসেন। তিনি সর্ব্বদা গুণের আদর করিতেন। একদিন বীরবর নামে এক রাজপুত চাকরী করিবার জন্য রাজবাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইলে, দ্বারবান্ গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা দ্বারবান্‌কে বলিলেন—"শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

দ্বারবান্ বীরবরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিল। তাহার বীরের মত আকৃতি দেখিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন, সে বেশ কার্য্যক্ষম। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত টাকা বেতন পাইলে তুমি চাকরী করিতে পার?' বীরবর বলিল—'মহারাজ! প্রতিদিন

সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাইলে আমি আপনার চাকরী করিতে পারি।' রাজা বলিলেন—'তোমার পরিবারে কয়জন লোক? এত বেশী বেতন চাহিলে কেন?' তখন বীরবর বলিল—'মহারাজ! আমার পরিবারে চারিজন লোক,—আমার স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা আর আমি স্বয়ং; ইহা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।' একথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'ইহার পরিবারে মোটে চারিজন লোক, তবে কেন এত অধিক বেতন চায়? বোধ করি, ইহার বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা আছে। যাহা হউক, কিছুদিনের জন্য রাখিয়া ইহার গুণ ও ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।' এই ভাবিয়া রাজা বীরবরকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

বীরবর প্রথম দিনের বেতন দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিল। অন্য অংশ পুনরায় দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ সাধু সন্ন্যাসীকে দিল। অন্য ভাগ দিয়া নানা রকম সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া শত শত গরীব দুঃখীকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইল। অবশিষ্ট সামান্য কিছু, তাহারা চারিজনে মিলিয়া খাইল। বীরবর প্রতিদিন এইরূপে দান করে, আর সন্ধ্যার সময় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সমস্ত রাত্রি রাজবাড়ীর দরজায় পাহারা দেয়। রাজা তাহার সাহস ও শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য যখন যাহা হুকুম করেন, নিতান্ত কঠিন হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিয়া আইসে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া রাজা বীরবরকে ডাকিয়া বলিলেন—'দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনা যাইতেছে; শীঘ্র ইহার কারণ জানিয়া আমাকে সংবাদ দাও।' বীরবর তখনই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া চলিল। রাজাও গোপনে তাহার পিছন পিছন চলিলেন।

ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া চলিতে চলিতে, বীরবর এক অতি ভীষণ শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল, পরমাসুন্দরী এক

রমণী শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তাহার নিকটে গিয়া বীরবর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কে? এই গভীর রাত্রে একাকী শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?' রমণী এই কথার কোন উত্তর না দিয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন অতি বিনয়ের সহিত বার বার জিজ্ঞাসা করিলে রমণী বলিল—'আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের বাড়ীতে নানারূপ অন্যায় অবিচার হইতেছে; সেজন্য তাঁহার রাজ্যে শীঘ্রই অলক্ষ্মী প্রবেশ করিবে; সুতরাং আমি এ-রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমি চলিয়া গেলে রাজার মৃত্যু হইবে। সেই দুঃখে আমি কাঁদিতেছি।'

প্রভুর এই বিপদের কথা শুনিয়া বীরবর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল—'দেবি! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে পারি না; কিন্তু রাজার এই সাংঘাতিক অমঙ্গল দূর করিবার যদি কোন উপায় থাকে, বলুন। আমি তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছি।' রাজলক্ষ্মী বলিলেন—'পূর্ব্ব দিকে এক ক্রোশ দূরে এক দেবী আছেন। ঐ দেবীর সম্মুখে যদি কেহ স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বলি দিতে পারে, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজার বিপদ দূর করিতে পারেন।'

রাজলক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া বীরবর তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে ছুটিল। রাজার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইল, তিনিও গোপনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর ঘরে গিয়া স্ত্রীকে জাগাইয়া এই সংবাদ দিলে, তাহার স্ত্রী পুত্রকে জাগাইয়া বলিল—'বৎস! তোমার মাথাটি দিলে রাজার আয়ু বাড়িবে, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিবেন!' পুত্র বলিল—'মা! একদিন ত মৃত্যু হইবেই। সুতরাং এই প্রাণটা যদি দেবতার সেবায় লাগাইতে পারি এবং তাহাতে যদি রাজার কল্যাণ হয়, তবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র কার্য্য শেষ করুন!'

পুত্রের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বীরবর অতিশয় আশ্চর্য্য হইল, তাহার চক্ষে জল আসিল। তখন সে স্ত্রীকে বলিল—'তুমি যদি খুশী হইয়া পুত্রকে দান করিতে পার, তবেই তাহাকে দেবীর নিকট বলি দিয়া রাজার উপকার করিতে পারি।' স্ত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে মত দিলে, বীরবর সপরিবারে দেবীমন্দিরে যাত্রা করিল। রাজা বীরবরের পরিবারের এই আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে অনেক ধন্যবাদ করিয়া গোপনে তাহাদিগের পিছন পিছন চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলে দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইলে, বীরবর দেবীকে বিধিমতে পূজা করিল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিল—'মা, জগদীশ্বরি! তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজ হাতে প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতেছি। দয়া কর, যেন আমার প্রভুর দীর্ঘ আয়ু হয়।'

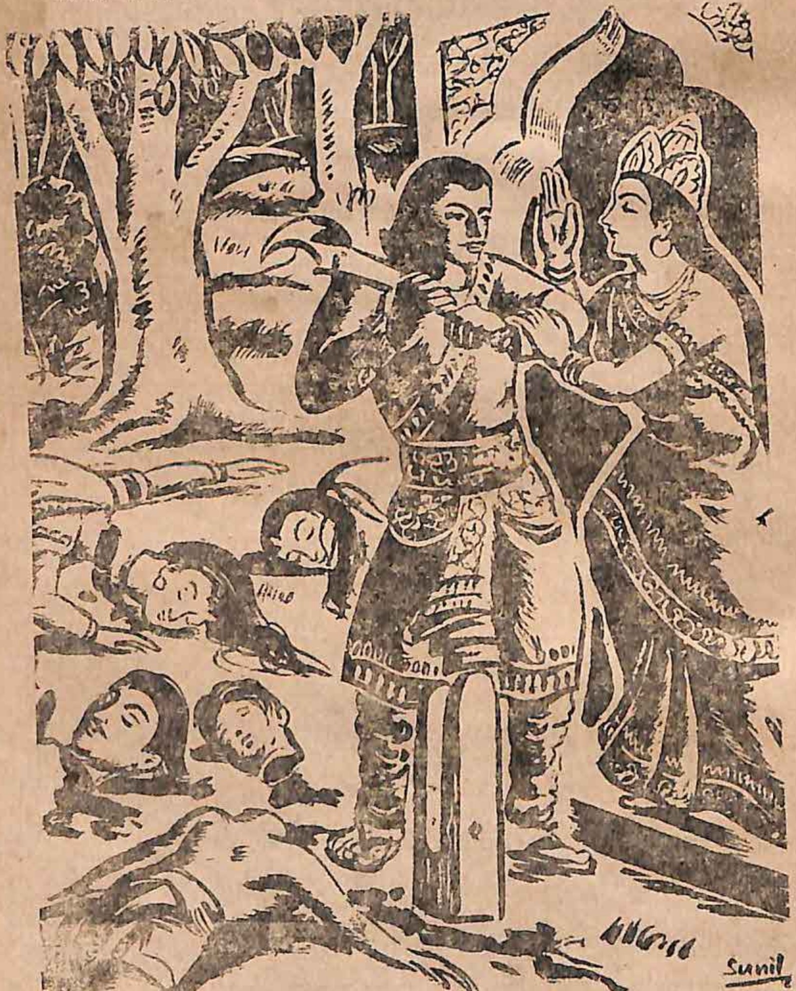
এই বলিয়া খড়্গ দিয়া পুত্রের মাথা কাটিল। তখন বীরবরের কন্যা প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুতে অস্থির হইয়া খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল। বীরবরের স্ত্রীও শোকে পাগল হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া বীরবর ভাবিল—'প্রভুর কার্য্য ত উদ্ধার করিলাম। এখন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে হারাইয়া বাঁচিয়া থাকায় সুখ কি?' এই ভাবিয়া সে খড়্গ দিয়া নিজের মাথাটি কাটিয়া ফেলিল।

এই সাংঘাতিক ব্যাপার দেখিয়া রাজার মনে সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—'যে রাজ্যের জন্য এমন প্রভুভক্ত সেবকের সর্ব্বনাশ হইল—সে রাজ্যভোগে ধিক্! আমি নিতান্ত স্বার্থপর ও নরাধম। নতুবা বীরবরকে কেন পুত্রবধে বাধা দিলাম না? তাহাকে আত্মহত্যা করিতেই বা দিলাম কেন? প্রথমেই তাহাকে নিষেধ করা আমার উচিত ছিল। আমি বড় পাপ কার্য্য করিয়াছি। এখন আত্মহত্যা করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

এই ভাবিয়া খড়্গ লইয়া রাজা নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইবা-

মাত্র দেবী তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলেন—'বৎস! তোমার সাহস দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন কি বর চাও বল।'

রাজা বলিলেন—'মা! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই



দেবী বলিলেন,—'এখন কি বর চাও, বল।'

চারিজনকে বাঁচাইয়া দিন।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তখনই চারিজনকে

জীবিত করিলেন। রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া রাজাকে আরও বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন রাজা রূপসেন সিংহাসনে বসিয়া সকলকে রাত্রির অদ্ভুত ঘটনা বলিলেন এবং সভাসদ্‌গণের সমক্ষে প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এখন বল দেখি, কাহার মহত্ত্ব বেশী?" রাজা বলিলেন—"আমার মতে, রাজারই বেশী মহত্ত্ব। কারণ, প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করাই সেবকের কাজ। সুতরাং বীরবর তাহার কর্ত্তব্য কাজই করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে রাজ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেবকের জন্য প্রাণ দিতে চাহিয়াছিলেন, এমন মহত্ত্ব কখনও দেখি নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



বেতাল বলিল—"মহারাজ ! ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেন বড় প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি শুকপক্ষী ছিল—তাহার নাম চূড়ামাণ। শুক রাজার বড় প্রিয় ছিল, তিনি সর্ব্বদা তাহাকে নিকটে রাখিতেন। একদিন রাজা কথায় কথায় চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পাখি ! তুমি কি কি বিষয় জান ?' শুক বলিল—'মহারাজ ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়ের সংবাদ আমি বলিতে পারি।' রাজা বলিলেন—'তাহা যদি হয়, তবে বল দেখি আমি বিবাহ করিতে পারি এমন উপযুক্ত কন্যা কোথায় আছে ?' চূড়ামণি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল—'মহারাজ ! মগধদেশের রাজা

বীরসেনের পরমাসুন্দরী ও অতিশয় গুণবতী এক কন্যা আছে—তাহার নাম চন্দ্রাবতী। তাহার সহিত আপনার বিবাহ হইবে।'

রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'শুকের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।' তখন প্রসিদ্ধ গণক চন্দ্রকান্তকে ডাকাইয়া বলিলেন—'গণনা করিয়া বলুন, কোন্ কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' চন্দ্রকান্ত গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া বলিলেন—'মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যা আপনার রাণী হইবেন।' ইহা শুনিয়া রাজা শুকের প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর বিবাহ স্থির করিবার জন্য এক বুদ্ধিমান ঘটককে মগধের রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মগধরাজকন্যা চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে তাঁহার প্রিয় এক শারিকা ছিল। এই শারিকাও তিন কালের সংবাদ জানিত। একদিন রাজকুমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল ত কাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে?' শারিকা বলিল—'রাজকন্যা! আমি দেখিতেছি ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।' শারিকার কথা শুনিয়া চন্দ্রাবতী যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে অনঙ্গসেনের ঘটক মগধে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজা বীরসেন তখনই সম্মত হইলেন। ঘটক ফিরিয়া আসিয়া অনঙ্গসেনকে এই সংবাদ দিল। তারপর বিবাহের দিন স্থির হইলে অনঙ্গসেন মগধে গিয়া চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করিলেন। পরে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

শ্বশুরালয়ে আসিবার সময় চন্দ্রাবতী তাঁহার আদরের শারিকাটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি সব সময় তাহাকে নিকটে রাখিতেন। চূড়ামণিও সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিত। একদিন রাজা ও রাণী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, শুক-শারিও সম্মুখে রহিয়াছে। এমন সময় রাজা বলিলেন—'রাণি! একাকী থাকিলে বড় কষ্টে দিন যায়,

তাই আমার ইচ্ছা তোমার শারিকার সঙ্গে আমার শুকের বিবাহ দিয়া দুই জনকে এক খাঁচায় রাখি; তাহা হইলে তাহারা বেশ আনন্দে থাকিতে পারিবে।' এ-কথায় রাণী আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলে, রাজাও শুক-শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঁজরায় রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর, একদিন রাজা ও রাণী অন্তঃপুরে; আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন এমন সময় দেখিলেন—শুক ও শারির মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। শারিকা বলিতেছে—'পুরুষেরা ধূর্ত্ত, স্বার্থপর ও অত্যাচারী; এজন্য তাহাদিগের সঙ্গে থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না।' আর শুক বলিতেছে—'মেয়েরা মিথ্যাবাদী, চঞ্চল, কুটিল—সকলের সর্ব্বনাশ করে।' শুক-শারির এইরূপ বিবাদ শুনিয়া রাজা বলিলেন—'তোমরা মিছামিছি কেন ঝগড়া করিতেছ?' শারিকা বলিল—'মহারাজ! পুরুষজাতি পাপী, এজন্য তাহাদিগের প্রতি আমার একটুও শ্রদ্ধা নাই। পুরুষের দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে আমি একটা গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে অতিশয় ধনবান্ এক বণিক্ ছিলেন—তাঁহার নাম মহাধন। বণিকের পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ ছিল। কিছুদিন পরে ভগবানের কৃপায় তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তিনি তাহার নাম রাখিলেন নয়নানন্দ। বালক বড় হইলে মহাধন তাহার লেখাপড়ার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশিয়া সে সর্ব্বদা মন্দ কাজে সময় নষ্ট করিত, লেখা-পড়ার প্রতি একটুও মন দিত না। ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল ততই সে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে বণিকের মৃত্যু হইলে, নয়নানন্দ সমস্ত সম্পত্তি হাতে পাইয়া মদ্যপান ও জুয়াখেলায় মত্ত হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পিতার ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন সে ইলাপুর ছাড়িয়া নানা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষে চন্দ্রপুরে

হেমগুপ্ত শেঠের নিকট গিয়া নিজের পরিচয় দিল। হেমগুপ্ত নয়নানন্দের পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অতি সমাদরের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাছা! তুমি হঠাৎ কি করিয়া এখানে আসিলে?'

নয়নানন্দ ফাঁকি দিয়া বলিল—'আমি বাণিজ্যের জন্য সিংহল দ্বীপে যাইতেছিলাম! দুর্ভাগ্যবশতঃ ঝড়ে পড়িয়া আমার জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে; আমি অতি কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছি। সঙ্গের লোকজন যে কে কোথায় গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। আমার জিনিষপত্রও সব জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া হেমগুপ্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন—'অনেক দিন হইতে রত্নাবতীর জন্য পাত্র খুঁজিতেছি; কিন্তু ভাল পাত্র পাই নাই। ভগবান দয়া করিয়া এতদিনে উত্তম পাত্র উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার গুণবান্ পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। এই বালক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে এবং নিশ্চয় তাঁহার গুণও পাইয়াছে। অতএব শীঘ্র ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিব।' এইরূপ স্থির করিয়া বণিক্ তাঁহার পত্নীকে সমস্ত বিষয় জানাইলে তিনিও সম্মত হইলেন। তখন উত্তম দিন দেখিয়া হেমগুপ্ত মহাধন শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিলেন। বরকন্যা পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে হতভাগা নয়নানন্দের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। সে পত্নী রত্নাবতীকে বলিল—'দেখ, অনেক দিন যাবৎ দেশত্যাগী হইয়াছি, আত্মীয়স্বজনের কোন সংবাদ জানি না। সে-জন্য মন বড় অস্থির। অতএব তোমার পিতা-মাতাকে বলিয়া বিদায়ের অনুমতি আনিয়া দাও। আর ইচ্ছা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে চল।'

রত্নাবতী স্বামীর কথা পিতা-মাতার নিকট বলিয়া তাঁহাদিগের মত লইল। তারপর স্বামীকে গিয়া বলিল—'মা বাবা সম্মত হইয়াছেন,

এখনই তোমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিবেন। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইও না—তোমার সঙ্গে লইয়া চল। তোমাকে ছাড়িয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।'

শ্রেষ্ঠী অনেক জিনিষপত্র ও ধনরত্ন দিয়া জামাতাকে বিদায় দিলেন। রত্নাবতীকে বিবাহের সমস্ত মহামূল্য অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া জামাতার সঙ্গে দিলেন। নয়নানন্দ নিতান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পত্নীর সহিত যাত্রা করিল।

কিছুদিন পরে তাহারা এক গভীর বনে গিয়া উপস্থিত হইলে, নয়নানন্দ রত্নাবতীকে বলিল—'এই বনে অত্যন্ত চোর-ডাকাতের ভয় আছে। মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিয়া এরূপ ভাবে পাল্কীতে যাওয়া উচিত নয়। অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দাও, আমি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখি। নগরের নিকট গিয়া আবার সেগুলি পরিবে। আর চাকরেরাও পাল্কী লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাউক। আমরা দুইজনে গরীবের বেশে যাই—তাহা হইলে নিরাপদে যাইতে পারিব।' রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া স্বামীকে দিল; এবং দাস, দাসী ও পাল্কী-বেহারা-দিগকে বিদায় দিয়া একাকী সেই দুষ্ট স্বামীর সঙ্গে চলিল। হতভাগা নয়নানন্দ ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর বনে গিয়া সতালক্ষ্মী রত্নাবতীকে হঠাৎ একটা কূয়ার মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। বেচারী রত্নাবতী কূয়ায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে' রোদন করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক পথিক ঐ পথে যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া কূয়ার নিকট আসিলে তাহার মধ্যে চাহিয়া দেখে—পরমাসুন্দরী এক কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে! তখন অনেক কষ্টে তাহাকে তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'কন্যা। তুমি কে? এই ভয়ানক বনে একাকী কেন আসিয়াছিলে? তোমার এরূপ দুর্দ্দশাই বা কি করিয়া হইল?'

পাছে স্বামীর নিন্দা হয় এইজন্য রত্নাবতী সত্য কথা প্রকাশ করিল না। বলিল—'আমি চন্দ্রপুরবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা, আমার

নাম রত্নাবতী। পতির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। এই স্থানে আসিবামাত্র হঠাৎ কতকগুলি দস্যু আসিয়া আমার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া আমাকে এই কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। তারপর আমার স্বামীকে প্রহার করিতে করিতে কোথায় যে লইয়া গিয়াছে কিছুই জানি না।'

এই কথা শুনিয়া পথিক রত্নাবতাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া শেষে পরম যত্নে তাহাকে হেমগুপ্ত শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা-মাতার একান্ত আদরের কন্যা ছিল। তাহার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া গেল এবং তাঁহারা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! কি করিয়া তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিল?' রত্নাবতী এবারেও সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল—'আমরা যখন এক বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, তখন হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমার সব অলঙ্কার কাড়িয়া লইল। পরে আমাকে এক কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আমার স্বামীকে প্রহার করিতে করিতে কোথায় যে লইয়া গেল, তিনি বাঁচিয়া আছেন কি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না।' ইহা শুনিয়া হেমগুপ্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'মা! তুমি ভাবিও না। চোরেরা টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, মিছামিছি আর প্রাণ নষ্ট করে না। আমার বিশ্বাস, তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন।' এইরূপে আশ্বাস দিয়া শ্রেষ্ঠী পুনরায় অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়া কন্যাকে শান্ত করিলেন।

এদিকে, নরাধম নয়নানন্দ দেশে গিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিল। কিন্তু পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়! নয়নানন্দ পুনরায় জুয়া খেলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই টাকাকড়ি সব শেষ করিয়া ফেলিল। ক্রমে তাহার দুরবস্থার সীমা রহিল না। তখন সেই দুষ্ট ভাবিল—'আমার দুষ্কার্য্যের কথা শ্বশুরবাড়ীর কেহ জানে না। সুতরাং একটা কিছু ফাঁকি দিয়া আবার সেখানে যাই। তারপর দিন কয়েক সেখানে থাকিয়া, সুবিধা পাইলেই কিছু লইয়া পুনরায় পলায়ন

করিব।' এই ভাবিয়া সে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া যাইবামাত্র প্রথমে রত্নাবতীর চোখেই পড়িয়া গেল।

রত্নাবতী সত্যই স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিল—'স্বামী দুষ্ট হইলেও তাঁহার সম্মান করিতে হয়। তাঁহাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই পুণ্যসঞ্চয় হয়। আর নিশ্চয়ই উনি শুধু বুদ্ধির দোষে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন! অতএব এই সামান্য দোষ মনে রাখিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইব না। যাহা হউক উনি বোধ করি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন। এখন হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় পলায়ন করিবেন। সুতরাং আগে তাঁহার ভয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।'

এই ভাবিয়া রত্নাবতী তাহার নিকটে গিয়া বলিল—'তোমার কোন ভয় নাই। আমি সত্য কথা গোপন করিয়া পিতামাতার নিকট বলিয়াছি—দস্যুরা অলঙ্কার লইয়া আমাকে কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই অবধি মা-বাবা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত আছেন; তোমাকে দেখিলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব তুমি এখানেই থাক, আমি তোমার সেবা করিয়া সুখী হইব। আর একটি কথা মনে রাখিও—আমি পিতা-মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি তুমিও সেইরূপই বলিবে।'

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া হতভাগা নয়নানন্দ তখনই শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী নিতান্ত সন্তু? হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে নয়নানন্দ স্ত্রীর উপদেশমতই উত্তর দিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর মনে দয়া হইল, তিনি নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। রত্নাবতী স্বামীর দোষ ভুলিয়া গেল। রাত্রিতে আহারাদির পর সে নূতন অলঙ্কারে সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর গৃহে গিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঘুমের ভাণ করিয়া দুষ্ট নয়নানন্দ নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলে, রত্নাবতীও ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমে অচেতন হইল। এই সুযোগে

দুরাত্মা বিছানা হইতে উঠিয়া একখানি তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ সাধ্বী স্ত্রীর গলা কাটিয়া অলঙ্কারগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।'

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া শারিকা বলিল—'মহারাজ! যাহা বলিলাম সমস্ত নিজের চোখে দেখিয়াছি। এখন আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুরুষজাতির প্রতি আমার ঘৃণা ও অবিশ্বাস হইবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না। আর সেই অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সঙ্গে কথা কহিব না এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিব।'

শারিকার কথা শুনিয়া রাজা হাসিলেন; তারপর শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'চূড়ামণি! তোমার স্ত্রীজাতির উপর এতটা বিরক্ত হইবার কারণ কি বল।'

চূড়ামণি বলিল—'মহারাজ! শুনুন—কাঞ্চনপুর নগরে এক বণিক্ ছিলেন, তাঁহার নাম সাগরদত্ত। শ্রীদত্ত নামে তাঁহার পরমসুন্দর ও শান্তশিষ্ট এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরের সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীকে শ্রীদত্ত বিবাহ করে। শ্রীদত্তের স্বভাবটি মিষ্ট, কোমল; আর জয়শ্রী ছিল অবাধ্য, চঞ্চল। সেজন্য দুইজনের মনের মিল হইল না; জয়শ্রী শ্রীদত্তকে ভালবাসিত না। কিছুকাল পরে বাণিজ্যের জন্য শ্রীদত্ত বিদেশে গেলে জয়শ্রী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

এদিকে শ্রীদত্ত বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছে, তখন সেও শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। অনেকদিন পরে জামাই শ্বশুরবাড়ী গেলে একটু ধুমধাম হইয়াই থাকে। তাই সমস্ত দিন আনন্দ-উৎসবে কাটাইয়া রাত্রিতে আহারাদির পর শ্রীদত্ত শুইতে গেল। শ্রেষ্ঠীপত্নী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা? অনেকদিন পরে জামাই ফিরিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্র গিয়া তাঁহার চরণসেবা কর।' জয়শ্রী স্বামীকে পছন্দ করিত না, সুতরাং সে কিছুতেই মায়ের কথায় সম্মত হইল না। শ্রেষ্ঠীপত্নী কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে তিনি জোর করিয়া তাহাকে

স্বামীর ঘরে দিয়া আসিলেন। অবাধ্য জয়শ্রী, স্বামীর দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল। শ্রীদত্ত কত মিষ্ট কথায় মিষ্ট ও ব্যবহারে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কত রকম চেষ্টা করিল, কিন্তু জয়শ্রী কিছুতেই মুখ ফিরাইল না; নিতান্ত বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত বিদেশ হইতে স্ত্রীর জন্য যে-সকল সুন্দর অলঙ্কার ও শাড়ী আনিয়াছিল তখন সেগুলি দিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে পর দুষ্টা জয়শ্রী রাগিয়া সব জিনিষ দূরে ফেলিয়া দিল। এইরূপে হার মানিয়া শেষে শ্রীদত্ত ঘুমাইয়া পড়িল।

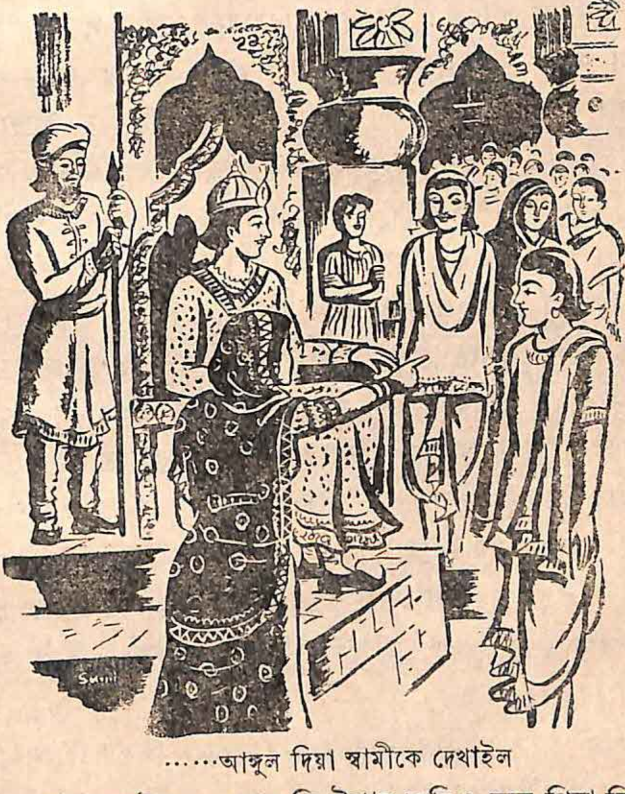
স্বামীর প্রতি এত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াও হতভাগিনী জয়শ্রীর সাধ মিটিল না। সে যখন দেখিল স্বামী গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন ভাবিল—'মা জোর করিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন, আমি কিছুতেই ঘরে থাকিব না।' এই ভাবিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া, স্বামী তাহার জন্য যে শাড়ী ও অলঙ্কার আনিয়াছিলেন সে-সব পরিয়া, নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। সেই সময় এক চোর রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জয়শ্রীকে একাকী দেখিয়া অলঙ্কারের লোভে তাহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

জয়শ্রীর জন্মের পর যে বৃদ্ধা ধাত্রী তাহাকে লালন-পালন করিয়াছিল, সে নিকটেই থাকিত। সেই রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তাহাকে কাল সাপে কামড়াইয়া দেয় এবং তারপর হইতে সে বিছানায় মরিয়াই পড়িয়া ছিল। এদিকে রাস্তায় চলিতে চলিতে জয়শ্রী ভাবিল—'তাইত, এত রাত্রে যাই কোথায়?' তখন হঠাৎ ধাইমার কথা মনে পড়াতে সে তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। চোর একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

নিকটে রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ ছিল, সেই গাছে এক পিশাচ থাকিত। জয়শ্রীকে দেখিবামাত্র 'সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া পিশাচের বিষম রাগ হইল। সে ভাবিল—'বটে! শ্রীদত্তের

মত গুণবান্ স্বামীকে যে স্ত্রী অবহেলা করে আর মায়ের কথা অমান্য করিয়া নির্লজ্জের মত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাকে কিছু সাজা দেওয়ার দরকার।' এই ভাবিয়া সেই পিশাচ হঠাৎ গাছ হইতে নামিয়া আসিল। তারপর মৃত ধাত্রীর শরীরে প্রবেশ করিয়া দাঁতের কামড়ে জয়শ্রীর নাকের ডগাটি কাটিয়া পুনরায় গাছে ফিরিয়া গেল। চোর এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক !

যাহা হউক নাকের ডগা হারাইয়াই জয়শ্রীর চৈতন্য হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাগও চলিয়া গেল। তখন সে ভাবিতে লাগিল—'হায়, হায় !



......আঙুল দিয়া স্বামীকে দেখাইল

এ কি সর্ব্বনাশ হইল ! এখন কি উপায় করি ? ঘরে গিয়া কি করিয়া মা-বাবাকে মুখ দেখাইব ? আমার কাটা নাক দেখিয়া লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা যখন হাসিবে, তখন যে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।'

জয়শ্রীর স্বভাব মন্দ হইলেও, বুদ্ধি ছিল প্রখর হঠাৎ তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'তাইত! এক কাজ করা যাউক– বাড়ী গিয়া স্বামীর পাশে শুইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠি।' তখন বাড়ীর সকলে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব—'আমার স্বামী মিছামিছি রাগ করিয়া আমাকে মারিয়াছেন আর কামড়াইয়া আমার নাক কাটিয়া দিয়াছেন।'

নিজের দোষ কাটাইবার এই অতি উত্তম উপায়টি স্থির করিয়া পাপিষ্ঠা জয়শ্রী বাড়ী ফিরিয়া গেল; সত্য সত্যই স্বামীর ঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চীৎকার করিবামাত্র বাড়ীর সকলে সেখানে আসিয়া দেখিল—জয়শ্রীর নাকের ডগা কাটা! তাহার সমস্ত কাপড় রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে এবং সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে! এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জয়শ্রী নিজের স্বামীকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—'ঐ লক্ষ্মীছাড়া ডাকাতটা আমার এই দুরবস্থা করিয়াছে!' তখন শ্রেষ্ঠীপরিবারের সকলে মিলিয়া শ্রীদত্তকে যারপরনাই তিরস্কার করিতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বেচারি শ্রীদত্ত হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ভাবিল—'হায়! আমি অতিশয় নির্ব্বোধ! ভাল রকম না জানিয়া, শ্বশুরবাড়ী আসাটাই আমার অন্যায় হইয়াছে। বিবাহের পর ভাবিতাম ক্রমে জয়শ্রীর মন বদ্‌লাইবে; আমার সঙ্গে যত পরিচয় হইবে ততই তাহার বিরক্তভাব দূর হইবে। কিন্তু হায়! শত ধুইলেও কয়লার ময়লা যায় না! এতদিনে বুঝিলাম জয়শ্রীয় মনটাই কুৎসিত। যাহা হউক, কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই ঘটিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীদত্ত নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে জয়শ্রীর পিতা রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজার লোক আসিয়া শ্রীদত্তকে ধরিয়া লইয়া গেল। উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে পর বিচারক জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন -'কে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে বল।' জয়শ্রী আঙ্গুল দিয়া স্বামীকে দেখাইল। তখন

শ্রীদত্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল —'ধর্ম্মাবতার! আমি এই ব্যাপারের কিছুই জানি না। এখন আপনার বিচারে যাহা ভাল মনে করেন করুন।' এই বলিয়া শ্রীদত্ত চুপ করিয়া রহিল। বিচারক শ্রীদত্তের কথা বিশ্বাস না করিয়া এবং তাহাকেই দোষী স্থির করিয়া ঘাতকদিগকে হুকুম দিলেন—'ইহাকে শূলে দাও।'

বিচারের সময় সেই চোর কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। এখন মিছামিছি একজন লোক মারা যাইতেছে দেখিয়া সে বিচারকের নিকটে আসিয়া বলিল—'হুজুর! ভাল রকম না জানিয়া কেন একজন নিরপরাধ লোককে বধ করেন? এই হতভাগা মেয়েটার কথা বিশ্বাস করিবেন না।' এই বলিয়া চোর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে বিচারক নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তখন তাঁহার হুকুমে একজন লোক ধাত্রীর বাড়ী গিয়া তাহার মুখের মধ্য হইতে জয়শ্রীর নাকের ডগা লইয়া আসিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিচারক নির্দ্দোষী শ্রীদত্তকে মুক্তি দিলেন এবং সত্যবাদী চোরকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। আর সেই দুষ্ট মেয়েটার মাথা নেড়া করিয়া তাহাতে ঘোল ঢালাইলেন; তারপর তাহাকে গাধায় চড়াইয়া সহরের চারিদিক ঘুরাইয়া, পরে দেশ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।'

চূড়ামণি বলিল—'মহারাজ! এইজন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আমার এত ঘৃণা'।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! জয়শ্রী আর নয়নানন্দ, এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী হতভাগা?"

রাজা বলিলেন—"আমার মতে, দুইজনই সমান!"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল বলিল,,—মহারাজ! ধারানগরে এক ক্ষমতাশালী রাজা রাজত্ব করিতেন ; তাঁহার নাম ছিল মহাবল। হরিদাস নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার দূত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, ঐ দূতের পরম রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম মহাদেবী। মহাদেবী বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন বাড়ীতে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। একদিন মহাদেবী পিতাকে বলিলেন—'বাবা! যাঁহার সকল রকমের গুণ আছে এমন লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন।' কন্যার এই উত্তম প্রার্থনায় হরিদাস মহা সন্তুষ্ট হইয়া গুণবান্ পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে বলিলেন—'হরিদাস! দক্ষিণ-দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে আমার পরম বন্ধু এক রাজা আছেন। অনেক দিন যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ জানি না, সেজন্য মনটা বড় ব্যস্ত আছে। তুমি গিয়া তাঁহাকে আমার কুশল জানাইয়া তাঁহার মঙ্গল সংবাদ লইয়া আইস।'

হরিদাস অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীতে গিয়া তাঁহাকে নিজ প্রভুর সংবাদ দিলেন। বন্ধুর কুশল জানিয়া হরিশ্চন্দ্রের আহ্লাদের সীমা রহিল না। হরিদাস রাজার অনুরোধে কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকিয়া গেলেন।

একদিন সভাভঙ্গের পর হরিদাস নিজের বাসা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—এক অপরিচিত ব্রাহ্মণকুমার বসিয়া আছে। তাহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'মহাশয়! আমি বিদেশী ব্রাহ্মণসন্তান। আপনার এক পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহ দিন্।' হরিদাস বলিলেন—'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, নানা শাস্ত্রে বিশারদ এবং সকল রকমে গুণবান পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব। তোমার বিদ্যা ও গুণের পরিচয় পাইলে বলিতে পারি, তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিব কিনা।' ব্রাহ্মণকুমার বলিল—'আমি শিশুকাল হইতে পরম যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আর আমি একখানি আশ্চর্য্য রথ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে চড়িলে চক্ষের নিমেষে যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়।'

ইহা শুনিয়া হরিদাস সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা তোমাকে কন্যা দান করিব। কাল সকালে তোমার রথখানি লইয়া আমার নিকট আসিও।' ব্রাহ্মণকুমার চলিয়া গেলে, হরিদাস রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণকুমার রথ লইয়া উপস্থিত হইলে দুইজনে তাহাতে চড়িয়া চক্ষের নিমেষে ধারানগরে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে হরিদাসের স্ত্রী ও পুত্র দুইজনে মহাদেবীর জন্য দুই বর ঠিক করিয়াছিল। তখন তাহারাও আসিয়া হরিদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

এইরূপে এক কন্যার জন্য তিন পাত্র উপস্থিত দেখিয়া হরিদাস নিতান্ত চিন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'তাইত! তিন জনকেই কথা দেওয়া হইয়াছে। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তিন জনই সমান—এখন কাহাকে নিরাশ করিব?' তখন বর তিনটিকে বলিলেন —'তোমরা আজ আমার বাড়ীতে থাক; আমি স্ত্রী ও পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় করিব।' বর তিনটি সম্মত হইয়া সে-রাত্রি হরিদাসের বাড়ীতেই রহিল। এদিকে রাত্রিতে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা ঘটিল। এক দুষ্ট রাক্ষস হঠাৎ আসিয়া ঘুমন্ত মহাদেবীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল মহাদেবী ঘরে নাই। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল? তখন সকলে মিলিয়া বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মহাদেবীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তিন বরের মধ্যে একজন যোগবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই জানিতে পারিত। সে হরিদাসকে বলিল - 'মহাশয়! ব্যস্ত হইবেন না। আমি যোগবলে দেখিতেছি, এক রাক্ষস আপনার কন্যাকে লইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে লুকাইয়া রহিয়াছে। এখন তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা দেখুন।' দ্বিতীয় বর বলিল—'আমি শব্দবেধী বাণ মারিয়া মহাবলবান্ শত্রুকেও বধ করিতে পারি। এখন কোন উপায়ে সেখানে যাইতে পারিলে, রাক্ষসকে মারিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিব।' তখন তৃতীয় বর বলিল—'আমার এই রথে চড়িয়া যাত্রা কর, নিমেষমধ্যে বিন্ধ্যাচলে যাইতে পারিবে।'

দ্বিতীয় বর তৎক্ষণাৎ রথে চড়িয়া বিন্ধ্যাচলে যাত্রা করিল। সেখানে গিয়া সে শব্দবেধী বাণে রাক্ষসকে বধ করিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিল। তারপর কন্যার সহিত রথে চড়িয়া ধারানগরে ফিরিতে তাহার

এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। তখন তিন বরের মধ্যে কে মহাদেবীকে বিবাহ করিবে এই কথা লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল। হরিদাস হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না।"

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! তিন বরের মধ্যে কে মহাদেবীকে বিবাহ করিবে?"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে যে রাক্ষসকে মারিয়া কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছে—সে।" বেতাল বলিল—"তিন জনই সমান গুণবান্; কন্যার উদ্ধার-কার্য্যে তিন জনেই সমান সাহায্য করিয়াছে। তবে কেন শুধু উদ্ধারকর্ত্তারই বিবাহের অধিকার হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ঠিক কথাই বলিয়াছ। তিন জনই অসাধারণ গুণ দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে—রাক্ষসকে মারিয়া যে কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, সে-ই আসল কাজটি করিয়াছে। সুতরাং তাহারই বেশী অধিকার।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



বেতাল বলিল—"মহারাজ !

ধর্ম্মপুরনগরে ধর্ম্মশীল নামে এক অতি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল অন্ধক। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা কাত্যায়নী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত পূজা করিতেন এবং পূজার শেষে দেবীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন—'হে দেবি ! দয়া করিয়া আমাকে পরমরূপবান্ ও গুণবান্ পুত্র দান কর।' কিন্তু হায় ! দেবীর কৃপা হইল না, রাজা এত করিয়াও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলেন না ! তাঁহার মনে বড়ই

দুঃখ হইল বটে কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না—অধিকতর নিষ্ঠার সহিত দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা নিয়মিত পূজার পর দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, 'মা কাত্যায়নি! তুমি যুগে যুগে ভক্তের দুঃখ দূর করিয়াছ, সেবকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ। আমিও তোমার সেবক, তোমার শরণ লইয়াছি—তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর মা।'

তখন দৈববাণী হইল; 'বৎস, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিলাম—শীঘ্রই তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ পুত্র যেমন রূপে-গুণে, তেমনই বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আর তেমনই যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ হইবে।' যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য দেবীর মন্দিরে মহা-আয়োজন করিয়া পূজা দিলেন। রাজবাড়ীতে আনন্দ-উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে দীনদাস নামে এক তাঁতি তাহার বন্ধুর সহিত বিশেষ কাজে রাজবাড়ীতে যাইতেছিল। পথে সেই নগরবাসী অন্য এক তাঁতির পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, —ঐ কন্যাকেই বিবাহ করিব! তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল—'আমাদের রাজা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়া পুত্র পাইয়াছেন। সুতরাং দেবীর অনুগ্রহ হইলে আমিও এই কন্যাকে লাভ করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া সে দেবীর মন্দিরে গিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল—'হে দেবি! যদি এই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে স্বহস্তে আমার মাথা কাটিয়া তোমার পূজা করিব।' তাঁতির বন্ধু দীনদাসের এইরূপ সাংঘাতিক মানসিক শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল এবং যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া গিয়া দীনদাসের পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানাইল।

এই সংবাদ শ্রবণে দীনদাসের পিতার মনেও ভাবনা হইল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া শেষে পুত্রের বন্ধুর সহিত এই কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্য-

বশতঃ কন্যার পিতা সকল কথা শুনিয়া তখনই বিবাহে সম্মত হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাকে পাইয়া দীনদাসের সুখের সীমাই রহিল না।

কিছুদিন পরে দীনদাসের শ্বশুর পারিবারিক কোন ক্রিয়া উপলক্ষ্যে দীনদাসকে নিমন্ত্রণ করাতে সে সেই বন্ধুর সহিত সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ীতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে রাজধানীর নিকটে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির দেখিয়া হঠাৎ তাহার পূর্ব্ব মানসিকের কথা মনে পড়ায় দীনদাস নিতান্ত দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিল—'হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ! দেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি—আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! যাহা হউক, এখনই দেবীর ঋণ শোধ করিব!'

ইহা স্থির করিয়া দীনদাস বন্ধুকে বলিল—'ভাই! আমার স্ত্রীকে লইয়া ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর; আমি দেবীকে প্রণাম করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া দীনদাস দেবীমন্দিরের নিকটে গিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরে স্নান করিল। তারপর দেবীর পূজা করিয়া—'মা! আমি তোমার নিকট যে মানসিক করিয়াছিলাম আজ তাহা শোধ করিতেছি'—বলিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে খড়্গ আনিয়া এক আঘাতে নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

এদিকে দীনদাসের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে বলিল—'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি দীনদাসকে ডাকিয়া আনি।' এই বলিয়া সে মন্দিরে গিয়া দেখিল—কি সর্ব্বনাশ! বন্ধুর মাথাকাটা দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে! তখন সে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—'কি বিপদ! এখন আমি করি কি! লোকে নিশ্চয়ই মনে করিবে আমিই আমার বন্ধুকে হত্যা করিয়াছি। সুতরাং এখন প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।' ভাবিয়া সেও তখনই খড়্গ দিয়া নিজের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

দীনদাসের স্ত্রী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে দেবী-মন্দিরে

গেল। সেখানে স্বামী ও তাঁহার বন্ধুর ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সে ভাবিল—'না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই আমার এ দুর্দ্দশা! যাহা হউক, বিধবা হইয়া দুঃখ কষ্টে বাঁচিয়া থাকার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভাল।' এই ভাবিয়া সে সেই রক্তমাখা খড়্গ লইয়া নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইবামাত্র দেবী তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন—'বাছা! আমি তোমার সাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি —বর প্রার্থনা কর।' তখন দীনদাসের স্ত্রী বলিল—'মা! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইঁহাদের দুইজনকেই বাঁচাইয়া দিন্।' দেবী বলিলেন—'তথাস্তু! তুমি এক কাজ কর, দুইজনের শরীরে মাথা লাগাইয়া দাও, তবেই তাহারা জীবিত হইবে।' এই বলিয়া দেবী শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। তাঁতিকন্যা আনন্দে দিশাহারা হইয়া এক-জনের মাথা অন্য জনের শরীরে লাগাইবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ জীবন পাইল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এখন, দুইজনের মধ্যে কে ঐ কন্যার স্বামী হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন —"সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই প্রধান ও উত্তম এবং সেইজন্যই মাথাকে উত্তমাঙ্গ বলে। সুতরাং যাহার শরীরে দীনদাসের মাথা লাগান হইয়াছে, সে-ই কন্যার স্বামী হইবে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! সপ্তম গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

চম্পানগরের রাজা চন্দ্রাপীড়ের ত্রিভুবনসুন্দরী নামে পরম-রূপবতী এক কন্যা ছিল। যথাসময়ে কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইলে রাজা তাহার জন্য পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাজকন্যার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

নানা দেশের রাজারা নিজেদের উত্তম চিত্র প্রস্তুত করাইয়া চন্দ্রা-পীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল চিত্র কন্যাকে দেখাইতেন, কিন্তু কন্যা কাহাকেও পছন্দ করিত না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ম্বরের আদেশ দিলে সে তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিল

—'বাবা! স্বয়ম্বরের কোন আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি বল-বিক্রমে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অসাধারণ হইবে, তাহাকেই আমি বরণ করিব।'

এই কথা চারিদিকে প্রচার হইবার কিছুদিন পরে একদিন চারিজন বর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন বলিল, 'মহারাজ! আমি অনেক বিদ্যা জানি, আর আমার একটি বিশেষ গুণ এই—প্রতিদিন একখানি করিয়া এমন চমৎকার বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি যে, তাহার মূল্য পাঁচ রত্ন।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ! আমি সমস্ত পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারি; আর আমার মত বলবান অন্য কেহ নাই।' তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ!, আমি সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত; আর আমার রূপের কথা নিজের মুখে বলিতে লজ্জা বোধ হয়—আপনিই তাহার বিচার করুন।' চতুর্থ বলিল—'মহারাজ! অস্ত্রবিদ্যায় আমি অদ্বিতীয়. শব্দবেধী বাণ আমার আয়ত্ত আছে।'

চারিজনের গুণের কথা শুনিয়া রাজা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে গেলেন এবং সকলের গুণ বর্ণন করিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! এই চারিজনের মধ্যে কাহাকে তোমার পছন্দ হয়?' ইহা শুনিয়া কন্যা কিছুই উত্তর দিল না, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ, এই চারিজনের মধ্যে কে রাজকন্যার পতি হইবার যোগ্য?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যে কাপড় প্রস্তুত করে সে তাঁতি, সুতরাং জাতিতে শূদ্র। যে ব্যক্তি পশু-পক্ষীর ভাষা জানে—সে বৈশ্য। যে সকল শাস্ত্রে বিশারদ, সে ব্রাহ্মণ। আর যে অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ, সে ক্ষত্রিয়—সুতরাং কন্যার স্বজাতীয়। অতএব, শাস্ত্র ও যুক্তি মতে সে-ই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

———



অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! শুন—

মিথিলানগরে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল গুণাধিপ। রাজা গুণাধিপের মহত্ত্ব ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার সভায় একদিন চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত চাকরীর আশায় উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে রাজা প্রায়ই সভাতে আসিতেন না, অন্তঃপুরে আরামে ঘুমাইয়া দিন কাটাইতেন। চিরঞ্জীব রাজার অপেক্ষায় প্রায় এক বৎসর বসিয়া রহিল ; ক্রমে তাহার খরচের সব টাকা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু তবুও সে রাজার দর্শন পাইল না।

এইরূপে একেবারে শূন্যহস্ত হইয়া চিরঞ্জীব ভাবিতে লাগিল—

'প্রায় এক বৎসর হইল দূর দেশ হইতে আসিয়া চাকরীর জন্য এই অপদার্থ রাজার বাড়ীতে বসিয়া আছি। চাকরী পাওয়া দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনই পাইলাম না! আর দেখা পাইলেই যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা কি করিয়া বুঝিব? তারপর মন্ত্রীই যখন রাজ-কার্য্য দেখেন তখন নিশ্চয়ই রাজার নিজের ক্ষমতা কম। এইরূপ অবস্থায় আমি যে চাকরী পাইব তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়! এদিকে হাতের টাকা পয়সাও ফুরাইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে। অতএব আর এখানে থাকা উচিত নয়। আজই বনে গিয়া ভগবানের তপস্যা আরম্ভ করিব।' এই ভাবিয়া চিরঞ্জীব রাজবাড়ী ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মন দিলেন। তারপর একদিন তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া শিকার করিতে গেলেন। সেখানে এক হরিণের পিছনে তাড়া করিয়া রাজা একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া গভীর হইতে গভীরতর বনে গিয়া উপস্থিত হইলে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন সেই হরিণটিকেও আর দেখিতে পাইলেন না।

রাজার মনে ভয় হইল। পিপাসায় তাঁহার তালু শুকাইয়া গিয়াছে, পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া জলের সন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ বনের মধ্যে এক কুটীর দেখিতে পাইলেন। এই কুটীরেই চিরঞ্জীব বনবাসী হইয়া তপস্যা করিতেছিল। রাজা কুটীরের দরজায় গিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে বলিলেন—'মহাশয়! পিপাসায় আমার প্রাণ যাইতেছে, শীঘ্র একটু জল দিন।' চিরঞ্জীব ব্যস্তসমস্ত হইয়া তখনই তাঁহাকে কিছু মিষ্ট ফল ও ঠাণ্ডা জল দিল। রাজা জল পান করিয়া এবং ফল খাইয়া সুস্থ হইলেন। তারপর চিরঞ্জীবকে বাস্তবিক ঋষির মত বোধ না হওয়াতে তিনি অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়! আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইলেন, আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এক্ষণে একটি অন্যায় প্রশ্ন

করিব, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার চেহারাখানি তপস্বীর মত হইলেও ভাবগতিক দেখিয়া আপনাকে তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

রাজার অনুরোধে চিরঞ্জীব নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—'আমি মিথিলার রাজা গুণাধিপের মহত্ত্ব ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরীর জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্য সভায় বাহির হইলেন না। তখন নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি এই বনে আসিয়া তপস্যা করিতেছি। আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা সত্য। এখনও আমার সংসারের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ রহিয়াছে, সেজন্য তপস্যায় মন বসিতেছে না।' ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ না করিয়া চিরঞ্জীবের কুটীরেই রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়া চিরঞ্জীবকে অতি যত্নের সহিত রাজধানীতে লইয়া গেলেন। তখন হইতে চিরঞ্জীব রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজা সর্ব্বদা তাহাকে নিকটে রাখিতেন এবং তাহার প্রতি অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিতেন। চিরঞ্জীবও প্রাণপণে তাঁহার আদেশ পালন করিত।

একদিন রাজা কোন বিশেষ কাজে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠাইলেন। কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে সমুদ্রের ধারে এক মন্দির দেখিয়া চিরঞ্জীব দেবতার পূজা করিল। পূজা করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র এক পরমাসুন্দরী কন্যা হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! কন্যার আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে অবাক্ ও মুগ্ধ হইয়া চিরঞ্জীব একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? কেনই বা পুতুলের মত এরূপভাবে দাঁড়াইয়া আছ?' চিরঞ্জীব বলিল—'আমি কোন কাজে বিদেশে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় এখানে আসিয়া

হঠাৎ তোমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।' তখন সেই কন্যা মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরটি দেখাইয়া বলিল—'এই পুকুরে স্নান কর তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করিতে পাইবে।'

একথায় মহা সন্তুষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব তখনই পুকুরে ডুব দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মাথা তুলিয়াই দেখিল সে তাহার নিজের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে ভিজা কাপড় বদ্‌লাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজবাড়া গিয়া রাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'শীঘ্র আমাকে সেখানে লইয়া চল।' তখন দুইজনে সমুদ্রতীরে গিয়া সেই মন্দিরে পূজা করিলেন, তারপর বাহিরে আসিবামাত্র সেই পরমাসুন্দরী কন্যা রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজা গুণাধিপের সুন্দর তেজস্বী মূর্ত্তি দেখিয়া কন্যা বলিল—'মহারাজ! আমি আপনার দাসী, যাহা হুকুম করিবেন তাহাই পালন করিব।' রাজা বলিলেন—'যদি আমার কথামত কাজ করিতে চাও তবে আমার প্রিয়পাত্র এই চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর।' কন্যা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—'মহারাজ! আমি আপনাকে বিবাহ করিতে চাহিলাম, আর আপনি এ কি আদেশ করিলেন?' রাজা বলিলেন—'এই মাত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমার আদেশ পালন করিবে। সুতরাং তোমার কথা রক্ষা কর—চিরঞ্জীবকে বিবাহ কর।' তখন নিরুপায় হইয়া কন্যা সম্মত হইল। রাজাও তখনই উভয়ের বিবাহ দিয়া তাহাদিগের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল বলিল—"মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী ভদ্র ও উদার? রাজা বলিলেন—"চিরঞ্জীব।" —"কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"রাজা শেষে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু চিরঞ্জীব শিকারের দিনে ফল, জল ও আশ্রয় দিয়া রাজার যে উপকার করিয়াছিল তাহার মূল্য বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—



নবম উপাখ্যান

বেতাল বলিল "মগধপুর নগরে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে এক অতিশয় ধনবান্ বণিক্ বাস করিত তাহার নাম হিরণ্যদত্ত। ঐ বণিকের মদনসেনা নামে সৌন্দর্য্যে অতুলনায়া এক কন্যা ছিল। একদিন মদনসেনা সহচরীদিগের সহিত উপবনে বেড়াইতে গেলে ঘটনাক্রমে সোমদত্ত নামে এক বণিক্‌পুত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। মদনসেনাকে দেখিয়া বণিক্‌পুত্র মুগ্ধ হইল এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিল—'সুন্দরি! তুমি আমাকে বিবাহ কর, নতুবা তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করিব।'

হঠাৎ এইরূপ প্রস্তাবে মদনসেনা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইল। পরে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া সোমদত্তকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন মদনসেনা বলিল,—'আমার বিবাহ

স্থির, পাঁচদিন পরেই বিবাহ হইবে, সুতরাং তুমি ক্ষান্ত হও।' একথায় সোমদত্তের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! সে অনেকক্ষণ অসাড় জড়পদার্থের মত স্তব্ধ থাকিয়া পরে নিরাশ হইয়া বলিল, 'নিতান্তই যখন নিরাশ করিলে তখন প্রতিজ্ঞা কর—বিবাহের পর আমাকে আর একবার দেখা না দিয়া তুমি স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইবে না।' মদনসেনা বণিক্‌পুত্রের কাতরতা দেখিয়া অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সোমদত্ত সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার পাঁচদিন পরে মদনসেনার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মদনসেনা শ্বশুরবাড়ী গিয়া রাত্রিতে স্বামীর বিছানার এক কোণে মাথাটি নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পরে স্বামী যখন তাহাকে আদর করিয়া মিষ্ট কথা বলিতে লাগিল, তখন মদনসেনা সোমদত্তের বিষয় বর্ণন করিয়া বলিল—'একবার যদি আমাকে তাহার কাছে যাইতে না দাও তবে আমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইবে - আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।' এ-কথায় স্বামী স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিল।

এইরূপে স্বামীর অনুমতি পাইয়া মদনসেনা রাত্রি দুই প্রহরের সময় সোমদত্তের বাড়ীতে চলিল। পথে বাহির হইয়া খানিক দূর যাইবামাত্র এক চোর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'সুন্দরি ! তুমি কে ? মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিয়া এত রাত্রিতে একাকী কোথায় যাইতেছ ?' এই বলিয়া চোর অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল। মদনসেনা অনেক মিনতি করিয়া বলিল—'আমি হিরণ্যদত্ত বণিকের কন্যা—মদনসেনা। অনেক কষ্টে স্বামীর অনুমতি লইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সোমদত্তের নিকট যাইতেছি। দোহাই তোমার ! এখন আমাকে বাধা দিও না। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর ; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ফিরিবার পথে তোমাকে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিব।' মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করিয়া চোর তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহার অপেক্ষায় সেইখানে বসিয়া রহিল।

এদিকে প্রতিজ্ঞামত সোমদত্তকে দেখা দিয়া মদনসেনা চোরের নিকট ফিরিয়া আসিলে, সে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—'কি আশ্চর্য্য! আমার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াও কন্যা ঠিক তাহার কথামত সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে! এরূপ যাহার সত্যনিষ্ঠা তাহার অলঙ্কার আমি কিছুতেই চুরি করিব না।' এই ভাবিয়া চোর মদনসেনাকে বলিল—'সুন্দরি! তোমার ব্যবহারে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই, তুমি চলিয়া যাও।' এই বলিয়া চোর প্রস্থান করিলে মননসেনাও স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মদনসেনা, তাহার স্বামী আর চোর—এই তিন জনের মধ্যে কাহার ব্যবহার বেশী ভদ্র?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোরের।"—"কেন?" বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—"মদনসেনার স্বামী প্রথমে বাধা দিয়া পরে অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিয়াছিল—ইহাতে আবার ভদ্রতা কি? আর মদনসেনা সোমদত্তকে কথা দিয়াছিল এবং সে-কথা রক্ষা করা উচিত বটে; কিন্তু অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। সুতরাং স্বামীর নিষেধ না মানিয়া অন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যাওয়াটা মদনসেনার পক্ষে নির্দ্দোষ কাজ হয় নাই। কিন্তু চোর অর্থপিশাচ—ধন পাইলে কিছুতেই ছাড়ে না! সে যে মদনসেনাকে হাতে পাইয়াও কেবল তাহার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দিল—ইহা কি সামান্য উদারতার কাজ?"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



দশম উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! এক সময়ে গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নামক নগরে অতিশয় গুণবান্ এক রাজা ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল গুণশেখর। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক অভয়চন্দ্র, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রীকে রাজা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার কথা কখনও অমান্য করিতেন না। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের পরামর্শে রাজা নিজেও শেষে বৌদ্ধ হইয়া শাস্ত্রের পূজা-পার্ব্বণাদি পরিত্যাগ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন—'রাজ্য-মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, কেহ যেন আর এই সমস্ত অন্যায় কাজ না করে।'

এই আদেশ প্রচারিত হইলে প্রজারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু রাজার ভয়ে তাহারা প্রকাশ্যে ঐ সকল অনুষ্ঠান করিতে সাহস

পাইত না। এদিকে চতুর মন্ত্রী অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি রাজাকে এতদূর আকৃষ্ট করিলেন যে, কেহ রাজার নিকট ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিলে তিনি তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে দেখিতে দেখিতে রাজ্যময় এই নূতন ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িল।

রাজা গুণশেখরের মৃত্যুর পর রাজপুত্র ধর্ম্মধ্বজ সিংহাসনে বসিলেন। তিনি মনে মনে বৌদ্ধধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেনবলিয়া সিংহাসনে বসিবার পর হইতেই বৌদ্ধ প্রজাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতার প্রিয় মন্ত্রী অভয়চন্দ্রের মাথা নেড়া করিয়া তাঁহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া নগরের চারিদিক্ ঘুরাইলেন এবং পরে দেশ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও রহিল না এবং পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিছুদিন পরে রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার তিন রাণীকে লইয়া উপবনে আমোদ-প্রমোদ করিতে গেলেন। সেখানে একটি সুন্দর পুকুরে রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটিয়া ছিল। রাজা জলে নামিয়া কতকগুলি ফুল তুলিলেন। তারপর তীরে আসিয়া সেগুলি তাঁহার এক রাণীর হাতে দিলেন। রাণী সেই ফুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ একটি ফুল তাঁহার পায়ের উপর পড়িবামাত্র ফুলের আঘাতে পা ভাঙ্গিয়া গেল! তারপর সন্ধ্যা হইলে যখন আকাশে চাঁদ উঠিল তখন চাঁদের শীতল কিরণ লাগিয়া দ্বিতীয় রাণীর শরীর জ্বলিয়া গেল! আর ঠিক সেই সময়ে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ঢেঁকির শব্দ হওয়াতে সেই শব্দে তৃতীয় রাণীর কানে তালা লাগিয়া গেল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন!”

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ! ঐ তিন রাণীর মধ্যে কে সকলের চাইতে দুর্ব্বল?” বিক্রমাদিত্য বলিলেন—“আমার মতে, চাঁদের শীতল কিরণ লাগিয়া যাঁহার শরীর পুড়িয়া গেল, তিনিই বেশী দুর্ব্বল।”

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



পথে চলিতে চলিতে বেতাল একাদশ গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল—"মহারাজ! পূর্ব্বকালে পুণ্যপুর নামক নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি প্রজাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজার মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন—'দেখ মন্ত্রী! রাজ্যশাসন বড় কঠিন কাজ। এতদিন রাজত্ব করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন কিছুদিনের জন্য আমাকে অবসর দাও।' এই বলিয়া মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া রাজা বল্লভ আমোদে মত্ত হইলেন। মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ কিছুদিন রাজকার্য্য চালাইয়া ক্রমে তিনি নিজেও নিতান্ত ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী প্রতিদিন

রাজবাড়ী হইতে গৃহে ফিরিয়া কিছুকাল বিষণ্ণ মনে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকাল তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখি কেন? তোমার শরীরই বা দিন দিন কেন এত রোগা হইতেছে?' মন্ত্রী বলিলেন—'রাজা আমার উপর রাজ-কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া ভোগসুখে মত্ত হইয়াছেন। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে যাহা কিছু গুরুতর বিষয় সমস্তই আমাকে একা করিতে হয় বলিয়া শরীর ও মন উভয়েরই অত্যন্ত পরিশ্রম হয় এবং সেইজন্যই ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছি।' তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'এক কাজ কর না কেন? তীর্থযাত্রার জন্য রাজার নিকট হইতে কিছুদিনের অবসর লও।'

স্ত্রীর উপদেশে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। অনেক তীর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র মহাদেবের এক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরে দেবতা দর্শন করিয়া মন্ত্রী বাহিরে আসিলে পর সমুদ্রের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, ঢেউয়ের ভিতর হইতে অতি অদ্ভুত এক সোনার গাছ বাহির হইয়াছে! আর সেই গাছের ডালে বসিয়া পরমাসুন্দরী এক কন্যা বীণা বাজাইয়া চমৎকার গান করিতেছে! মন্ত্রী নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে সেই কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে সেই আশ্চর্য্য গাছটি ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ তখনই রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জানাইলে রাজাও মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি নিজের চক্ষে এই ব্যাপার দেখিবেন। তখন পুনরায় মন্ত্রীর উপর রাজ্য-ভার দিয়া তিনি একাকী সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া মন্ত্রীর উপদেশ মত মহাদেবের পূজা করিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিবামাত্র সত্য সত্যই সেই সোনার গাছ

এবং তাহার উপরে সেই কন্যা দেখা গেল। তখন সেই সুন্দরী কন্যার গান শুনিয়া রাজা এমনই মুগ্ধ হইলেন যে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাজা ভাল সাঁতার জানিতেন, সুতরাং সেই গাছে চড়িতে তাঁহার বেশীক্ষণ লাগিল না। কিন্তু গাছে চড়িবামাত্র, গাছ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

পাতালে গিয়া সেই কন্যা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে? তুমি এখানে কেন আসিলে?' রাজা বলিলেন—'হে সুন্দরি! আমি পুণ্যপুরের রাজা—বল্লভ। তোমায় দেখিয়া ও তোমার আশ্চর্য্য সঙ্গীত শুনিয়া তাহারই আকর্ষণে এখানে আসিয়াছি—এখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে সুখী হইব।' এ-কথায় কন্যা বলিল—'মহারাজ! তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে বিবাহের পর প্রতি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী দিনে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবে, তবেই তোমাকে বিবাহ করিব।' কন্যার কথা শুনিয়া রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তারপর দুইজনের বিবাহ হইয়া গেল। রাজা কন্যাকে লইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইলে রাণী রাজাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া দূরে যাইতে বলিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি ভাবিলেন—'আমাকে তাড়াইবার জন্য রাণী এত ব্যস্ত হইয়াছে কেন? একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া রাজা আড়ালে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ এক বিকটাকৃতি রাক্ষস আসিয়া ভীষণ ভয় দেখাইয়া রাণীকে শাসাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তলোয়ার হস্তে ছুটিয়া গিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন রাণীর যা আনন্দ হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলিলেন—'মহারাজ!

এই দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া তুমি আমাকে বাঁচাইলে। এতদিন ইহার হাতে কি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।'

রাজা নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'রাণি! এই হতভাগা



...মুহূর্ত্তমধ্যে রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসের হাতে কেন তুমি দুঃখ পাইয়াছ, তাহার কারণ আমাকে বল।'

রাণী বলিলেন—'মহারাজ! শুন তবে বলি। আমি গন্ধর্ব্বকন্যা —আমার নাম রত্নমঞ্জরা। আমার পিতার নাম বিদ্যাধর, তিনি গন্ধর্ব্বদের রাজা। প্রতিদিন আহারের সময় আমি নিকটে বসিয়া না থাকিলে পিতা তৃপ্তির সহিত খাইতে পারিতেন না। একদিন আমি খেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পিতার আহারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে জন্ম লও। আর, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী দিনে এক রাক্ষস আসিয়া তোমাকে নানা রকমে শাস্তি দিবে।" পিতার শাপ শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। তখন আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতি-মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ইহাতে পিতার মনে দয়া হইল এবং তিনি বলিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, এক মহাবলবান্ রাজা এই রাক্ষসকে বধ করিয়া তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন।" মহারাজ! সেই শাপে এতদিন আমি কষ্ট পাইতেছিলাম। আজ তুমি আমাকে মুক্ত করিলে। এখন অনুমতি দাও আমি পিতার নিকট চলিয়া যাই।'

এই কথা শুনিয়া রাজার মনে বড়ই দুঃখ হইল, তিনি বলিলেন—'রাণি! এত কষ্ট করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম, এখন একবার দয়া করিয়া আমার রাজধানীতে চল; পরে না হয় তোমার পিতার কাছে যাইও।' রত্নমঞ্জরী অকৃতজ্ঞ নহেন; তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তখনই রাজার সহিত তাঁহার রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া কিছুকাল পরে রাজা যখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে পিতার নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন তখন রত্নমঞ্জরী বলিলেন —'মহারাজ! বহুদিন তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমার স্বভাব মানুষের মত হইয়া গিয়াছে। এখন পিতার নিকট গেলে আর তেমন আদর যত্ন পাইব না। সুতরাং, আমার আর গন্ধর্ব্বলোকে যাইবার ইচ্ছা নাই; তোমার নিকটেই আজীবন থাকিব।' তখন রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাজকার্য্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া রত্নমঞ্জরীর

সহিত পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন।”

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ! বল দেখি, মন্ত্রী কেন প্রাণত্যাগ করিলেন?” বিক্রমাদিত্য বলিলেন—“সত্যপ্রকাশ ভাবিল রাজা নিজের সুখ লইয়াই রাতদিন ব্যস্ত, রাজ-কার্য্যে একেবারে উদাসীন! এরূপ অবস্থায় প্রজারাই বা কতদিন আমাকে শ্রদ্ধা করিবে? এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার মনটাকে একেবারে চুরমার করিয়া দেওয়াতে সত্যপ্রকাশের মৃত্যু হইল।”

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল দ্বাদশ গল্প আরম্ভ করিল—"মহারাজ! দেবস্বামী নামে পরম রূপবান্ এক ব্রাহ্মণ চূড়াপুরে বাস করিতেন। তিনি বৃহস্পতির মত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং কুবেরের মত ধনবান্ ছিলেন। লাবণ্যবতী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। লাবণ্যবতী

সত্য সত্যই পরম রূপলাবণ্যবতী—তাহার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেবস্বামী তাহাকে লইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে ব্রাহ্মণদম্পতি বাড়ীর ছাদে ঘুমাইতেছিলেন। ঐ সময় এক গন্ধর্ব্ব রথে চড়িয়া আকাশে বেড়াইতেছিল। হঠাৎ ব্রহ্মণ-কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইল এবং রথশুদ্ধ নামিয়া আসিয়া ঘুমন্ত লাবণ্যবতীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিলে দেবস্বামী স্ত্রীকে না দেখিতে পাইয়া একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। এদিক্ সেদিক্ উপর নীচ সর্ব্বত্র সন্ধান করিলেন, কত ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল—লাবণ্যবতীকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে নিতান্ত নিরাশ ও পাগলের মত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া বলিলেন—'মহাশয়! ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি, কিছু খাবার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।' গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তখনই এক বাটি দুধ আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। এদিকে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে একটা কেউটে সাপ ঐ দুধে মুখ দিয়া উহা বিষাক্ত করিয়াছিল, সেটা কেহই জানিত না। সুতরাং ঐ দুধ পান করিবামাত্র সাপের বিষে আগন্তুক ব্রাহ্মণের শরীর কেমন যেন অবসন্ন হইতে লাগিল, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে—'তুমি বিষ খাওয়াইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে?'– এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া মারা গেলেন! এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'তুই দুধে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ত ব্রহ্মবধ হইল! তুই নিতান্ত পাপী, আমি তোর মুখ দেখিব না!' এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, এই ব্রহ্মহত্যা ব্যাপারে কাহার কি দোষ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"সাপের মুখে ত বিষ থাকেই, সুতরাং সাপকে দোষ দেওয়া যায় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী দুধে যে বিষ আছে তাহা জানিতেন না—সুতরাং তাঁহাদেরও দোষ নাই। আর আগন্তুক ব্রাহ্মণ যখন না জানিয়া দুধ পান করিয়াছেন, তখন তাঁহারও আত্মহত্যার পাপ হয় নাই। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভাল রকম সন্ধান না লইয়া মিছামিছি বেচারী ব্রাহ্মণীকে তাড়াইয়া দিলেন! অতএব, এ-ক্ষেত্রে কেবল তাঁহারই দোষ।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ত্রয়োদশ গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর ঃ

চন্দ্রহৃদয়নগরের রাজা রণধীর বড় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভয়ে রাজ্যে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস পাইত না। প্রজারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত মনে বাস করিত। একবার নগরে বড় চোরের উপদ্রব হইল। প্রজারা সকলে মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিলে তিনি অনেকগুলি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সমস্ত রাত্রি অতি সতর্কতার সহিত পাহারা দিত। কিন্তু এত করিয়াও চোরের উপদ্রব থামিল না, বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

প্রজারা পুনরায় রাজার নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইল। রাজা বলিলেন—'তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আজ রাত্রিতে আমি নিজে পাহারা

দিব।' রাত্রিতে একাকা ছদ্মবেশে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাজা নগর-রক্ষার জন্য বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া একজন অপরিচিত লোককে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? কোথায় যাইতেছ?' লোকটি বলিল—'আমি চোর, চুরি করিতে বাহির হইয়াছি। তুমি কে? কি জন্য আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ?' রাজা বলিলেন—'আমিও চোর।' ইহা শুনিয়া সে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'তবে আইস, দুইজনে মিলিয়া চুরি করিতে যাই।' রাজা সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন।

চোর রাজার সহিত এক ধনীর বাড়ীতে গিয়া সিঁধ কাটিয়া অনেক ধন-রত্ন পাইল। তারপর তাঁহাকে লইয়া সহরের বাহিরে খানিক দূর গিয়া একটা গুপ্তপথে পাতালে প্রবেশ করিল। সেখানেই ছিল চোরের বাড়ী। তখন রাজাকে বাড়ীর দরজায় বসাইয়া সে ভিতরে গেল। এই সময়ে এক দাসী আসিয়া কথায় কথায় রাজার পরিচয় পাইয়া বলিল—'মহারাজ! বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ, শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর। যাহার সঙ্গে আসিয়াছ সে দুর্দ্দান্ত দস্যু; ফিরিয়া আসিয়াই তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।' দাসীর কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিলেন—'আমি ত পথ ভুলিয়া গিয়াছি, পলাইব কি করিয়া? তুমি অনুগ্রহ করিয়া পথ দেখাইয়া আমাকে বাঁচাও।' দাসী তখনই পথ দেখাইয়া দিল; রাজাও পলাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রণধীর সৈন্যসামন্তের সহিত পাতালে প্রবেশ করিয়া সেই চোরের বাড়ী অবরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালপুরী রক্ষা করিত। চোর রাজার ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া, রাক্ষসের শরণ লইল। তারপর রাক্ষসের সহিত রাজার সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুষ্ট রাক্ষস রাজার হাতী, ঘোড়া, সৈন্য সমস্ত গিলিতে আরম্ভ করিল। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রণধীর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

রাজাকে একাকী পলায়ন করিতে দেখিয়া চোরের স্পর্দ্ধা দেখে কে! সে তাঁহার পিছন পিছন তাড়া করিয়া গালি দিতে লাগিল—'ধিক্ তোমাকে! এত বড় রাজা হইয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ? তোমার নরকেও স্থান নাই।' এই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চোরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর রাজা চোরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা হুকুম দিলেন—'দুষ্ট চোরকে গাধায় চড়াইয়া সহরের চারিদিক ঘুরাইয়া আন; তারপর ইহাকে শূলে দাও।' এই চোর অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; সুতরাং ইহার দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এদিকে রাজভৃত্যেরা চোরকে লইয়া ধর্ম্মধ্বজ নামক বণিকের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া বণিকের কন্যা শোভনার মন একেবারে গলিয়া গেল। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সে পিতাকে বলিল—'বাবা! রাজার কাছে বলিয়া কহিয়া যেরূপে পার ঐ চোরকে উদ্ধার করিয়া আন!' কন্যার এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া বণিক্ একেবারে অবাক্! তিনি বলিলেন—'মা! তুমি বল কি? যাহার জন্য রাজার সমস্ত সৈন্য গিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহাকে কি তিনি আমার কথায় ছাড়িয়া দিবেন? কখনই না।' পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া শোভনা বলিল—'বাবা! আমি মনে মনে উহাকেই বিবাহ করিয়াছি। তোমার সর্ব্বস্ব দিয়া হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে—যদি না আন, আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।'

বণিক্ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। যাহা হউক প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কন্যার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি রাজার নিকট গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন।

এই সময়ে রাজার লোকেরা চোরকে সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইয়া

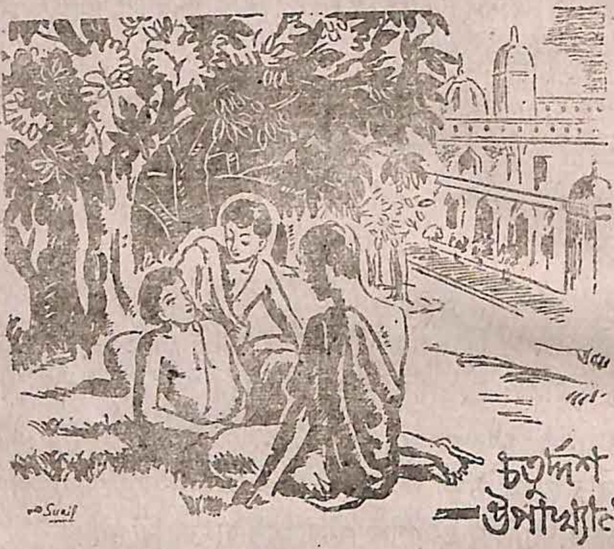
বধ্যভূমিতে শূলের কাছে লইয়া আসিল। শোভনার এই অদ্ভুত আব্‌দারের কথা চারিদিকে প্রচার হওয়াতে তাহা চোরও শুনিতে পাইয়াছিল। তারপর তাহাকে শূলে দিবার সময় সে প্রথমে হাসিল পরে রোদন করিল।

এদিকে চোরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বণিককন্যা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে চিতা প্রস্তুত হইলে শোভনা চোরকে শূল হইতে নামাইয়া তাহার সহিত চিতায় শয়ন করিল।

তখন লোকেরা চিতায় আগুন দিবার উপক্রম করিলে রাজ-অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী কাত্যায়নী দেবী শ্মশানে দেখা দিয়া শোভনাকে বলিলেন—'বাছা! তোমার সাহস ও সতীত্ব দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি—এখন বর প্রার্থনা কর।' শোভনা বলিল—'জননি! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাকে বাঁচাইয়া দিন্।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ চোরকে বাঁচাইয়া দিলেন!"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, চোর কেন প্রথমে হাসিল, তারপর কেন কাঁদিল?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোর ভাবিল—'কি অসম্ভব কথা! আমার মৃত্যুর সময় আমার প্রতি এই কন্যার ভালবাসা হইল!' এই ভাবিয়া সে প্রথমে হাসিয়াছিল। তারপর আবার যখন ভাবিল—'হায়! এই কন্যা আমার জন্য রাজাকে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি হতভাগা তাহার এমন কি উপকার করিতে পারিতাম।' তখন সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



পথে চলিতে চলিতে চতুর্দ্দশ গল্প আরম্ভ করিয়া বেতাল বলিল ঃ "মহারাজ! কুসুমবতী নগরের রাজা সুবিচারের পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম চন্দ্রপ্রভা। একদিন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা পিতার অনুমতি লইয়া সখীদিগের সহিত রাজবাড়ীর নিকটস্থ এক উপবনে বেড়াইতে গেলেন। রাজার উপবনে অনুমতি না লইয়া কোন পুরুষ যাইতে পারে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে মনস্বী নামে এক পরম-রূপবান্ বিদেশী ব্রাহ্মণযুবক রৌদ্রে পথ চলিতে চলিতে নিতান্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া ঐ উপবনের এক নির্জ্জন কুঞ্জে ছায়ার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণকুমার জানিত না যে উপবনে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাহাকে অন্য কেহ দেখিতেও পায় নাই।

এদিকে রাজকুমারী সখীদের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে দৈবাৎ সেই কুঞ্জের নিকটে গেলেন। তাঁহাদিগের পায়েরনূপুরের রুনুঝুনু শব্দে মনস্বীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে হঠাৎ চোখের সম্মুখে অপূর্ব্বসুন্দরী

রাজকন্যাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহিত হইয়া রহিল। রাজকুমারীও মনস্বীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সখীগণ এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করিল। মনস্বী কিছুই বলিতে পারিল না; রাজকন্যা চলিয়া গেলে পর দুঃখে বিহ্বল হইয়া সে সেখানেই অজ্ঞান অবস্থায় রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঐ পথে দেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহারাও রৌদ্রে নিতান্ত কাতর হইয়া বিশ্রামের জন্য সেই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে অজ্ঞান মনস্বীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন ভূদেব নানা উপায়ে তাহাকে সজ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? তোমার এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল?' মনস্বী বলিল—'যে দুঃখ দূর করিতে পারিবে, তাহাকেই দুঃখের কথা বলা উচিত। নতুবা মিছামিছি বলিয়া নির্ব্বোধের মত কাজ করিব কেন?' ইহা শুনিয়া ভূদেব বলিলেন—'তোমার দুঃখের কথা আমাকে বল; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা দূর করিবই করিব।' তখন মনস্বী বলিল—'মহাশয়! ক্ষণকাল পূর্ব্বে এক রাজকন্যাকে দেখিলাম; তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন! এখন যদি আর তাঁহার সন্ধান না পাই, তবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব!'

তখন ভূদেব বলিলেন—'তুমি আমার সঙ্গে চল, যেরূপে পারি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।' এই বলিয়া ভূদেব মনস্বীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাহাকে এক আশ্চর্য্য মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—'এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তুমি তখনই ষোল বৎসর বয়সের পরমাসুন্দরী কন্যা হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই পুনরায় নিজের রূপ পাইবে।'

মন্ত্রবলে মনস্বী ষোল বৎসরের কন্যা হইল। ভূদেবও আশী বৎসরের

বৃদ্ধ হইলেন এবং মনস্বীকে পুত্রবধূ করিয়া রাজা সুবিচারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঠাকুর! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? আপনার কি প্রয়োজন ?' ভূদেব বলিলেন—'মহারাজ! আমার বাড়ী গঙ্গায় পূর্ব্বপারে। আমার এই পুত্রবধূটিকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে আনিতে গিয়াছিলাম। বধূর সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, গ্রামে গ্রামে ওলাউঠা লাগিয়াছিল, তাই সমস্ত লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। বাড়ীতে ব্রাহ্মণী ও বিশ বছরের পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এই উপদ্রবের সময় তাহারাও কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তাহাদিগের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। সেজন্য মনে করিয়াছি বধূকে কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট রাখিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সন্ধানে বাহির হইব। মহারাজ! আপনিই বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র, সুতরাং আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া পুত্রবধূটিকে আপনার নিকটে রাখুন।'

ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন—'পরের মেয়ে রাখা মহা মুস্কিলের কাজ; কিন্তু না রাখিলেও বুড়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। বরং এক কাজ করি—রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার নিকট ইহাকে রাখিয়া দেই, সে ইহাকে দেখিবে শুনিবে।' এই ভাবিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ঠাকুর! আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম, পুত্রবধূটিকে আমার কাছে রাখিয়া যান।' ভূদেব মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণবধূকে রাজা অন্তঃপুরে রাজকন্যার নিকট লইয়া গেলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র রাজকুমারী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের সমবয়সী দেখিয়া তাহাকে আপন ভগ্নীর মত যত্ন করিতে ও ভালবাসিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র স্নান করেন, একত্র আহার করেন, সর্ব্বদা একসঙ্গে বেড়ান। এইরূপে মনস্বী ক্রমে রাজকুমারীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিল। একদিন সে রাজকুমারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল,—'রাজকুমারি ! তুমি সব সময়ে কি ভাব ? সর্ব্বদাই এমন বিষণ্ণ থাক কেন ?'

রাজকন্যা বলিলেন—'সখি ! একদিন সহচরীগণের সঙ্গে উপবনে বেড়াইতে গিয়া ঘটনাক্রমে এক পরমসুন্দর ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিয়াছিলাম ; তাঁহার কথা আমি আর কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার নাম কি, বাড়ী কোথায়—কিছুই জানি না। একথা কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি—মনের দুঃখ গোপনে সহ্য করিতেছি। তোমাকে বড় ভালবাসি, তাই তোমাকে বলিলাম—একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।' রাজকন্যার মনের কথা জানিতে পারিয়া মনস্বী বলিল—'আচ্ছা, আমি যদি সেই ব্রাহ্মণকুমারকে আনিয়া দিতে পারি, তবে কি পুরস্কার দিবে ?' রাজকন্যা বলিলেন—'দাসী হইয়া চিরজীবন তোমার সেবা করিব।' তখন মনস্বী চক্ষের নিমেষে নিজের রূপ ধরিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারী হতবুদ্ধি হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন—তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি আশ্চর্য্য ! এতদিন তুমি আমার সখীর রূপ ধরিয়া ছিলে কিরূপে ? কি করিয়াই বা পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকুমারের রূপ ধরিলে ?' তখন মনস্বী ভূদেবের কথা আর তাঁহার সেই আশ্চর্য্য মন্ত্রের কথা সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া গন্ধর্ব্বমতে রাজকন্যাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পর মনস্বী কন্যাবেশেই অন্তঃপুরে থাকিতে লাগিল। কাহাকেও আপনার পরিচয় জানাইল না।

এইরূপে অনেকদিন চলিয়া গেল, তবু ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে লইতে আসিলেন না। রাজা সুবিচার মনে মনে বিরক্ত হইলেন। রাজবাড়ীর লোকেরাও মনস্বীকে আর তেমন আদর যত্ন করে না, ইচ্ছা করিয়াই যেন সকলে তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকে। অনাদরের মাত্রা দিন দিন ক্রমেই বাড়িতে চলিল দেখিয়া মনস্বী ভাবিল—'না, এখানে থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং পলায়ন করাই উচিত।' এই ভাবিয়া একদিন সে নিজের রূপ ধরিয়া গোপনে রাজবাড়ী

হইতে পলায়ন করিল। এই সংবাদ শ্রবণে রাজা অতিশয় চিন্তিত হইয়া ভাবিলেন—'কি সর্ব্বনাশ! বুড়া ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন তাঁহার পুত্রবধূকে চাহিবেন তখন কি বলিব? এখন উপায় কি?'

এদিকে মনস্বী ভূদেবের নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ভূদেব শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন বন্ধু শশীকে বিশ বৎসরের পুত্র সাজাইয়া নিজে পুনরায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ হইলেন এবং দুই-জনে রাজা সুবিচারের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার ফিরিয়া আসিতে এত দেরী হইল কেন?' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন—'মহারাজ! পুত্রের সন্ধানে অনেক স্থানে যাইতে হইয়াছে; সেজন্য দেরী হইল। যাহা হউক পুত্রকে পাইয়া লইয়া আসিয়াছি; এখন বধূকে লইয়া বাড়ী যাইব।' তখন রাজা ব্রহ্মশাপের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত-যোড় করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

ক্রোধে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাজাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—'পাপিষ্ঠ! বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট পুত্রবধূটিকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, আর তুমি তাহার খবর রাখ না? শীঘ্র তাহাকে আনিয়া দাও। যদি না পার, এখনই তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দাও—নতুবা এই মুহূর্ত্তে তোমায় শাপ দিব।'

ব্রাহ্মণের শাপের ভয়ে রাজা তখনই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শুভদিনে ও উত্তম লগ্নে রাজকুমারীর সহিত শশীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ভূদেব রাজকন্যাকে লইয়া বাড়ী আসিলে শশী ও মনস্বীর মধ্যে—'এই স্ত্রী আমার আমার' বলিয়া মহা বিবাদ বাধিয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, শাস্ত্র ও যুক্তিমতে রাজকন্যা এখন কাহার স্ত্রী হইবে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"রাজকন্যা মনস্বার স্ত্রী হইবে।" বেতাল বলিল—"কেন?"

রাজা বলিলেন—"পূর্ব্বে মনস্বীর সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছে। এখন সে বাঁচিয়া থাকিতে শাস্ত্রমতে কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং জানিয়া হউক আর না জানিয়া হউক, রাজা যে শশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন, সে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—সুতরাং তাহা বিবাহই হয় নাই। অতএব, রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হইলেই শাস্ত্র ও ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয়।"

ইহা শুনিয়াঃবেতাল পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মত ইত্যাদি—

———



বেতাল বলিল—"মহারাজ! পঞ্চদশ গল্প বলিতেছি শুন—হিমালয় পর্ব্বতের উপরে পুষ্পপুর নামে অতি সুন্দর এক নগর ছিল। গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতু ছিলেন ঐ নগরের রাজা। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়; সুতরাং পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া বৃক্ষ রাজাকে বর দিলেন। তাঁহার পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন, জীমূতবাহন। জীমূতবাহন বড় হইয়া ধার্ম্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ হইলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইলেন।

কিছুদিন পরে জীমূতকেতু পুনরায় কল্পবৃক্ষের পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন—'আমার প্রজারা অতিশয় ধনবান হউক।' রাজার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এদিকে প্রচুর ধন পাইয়া প্রজাদের অহঙ্কারের সীমা রহিল না; তাহারা রাজাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজার আত্মীয়স্বজনেরা ভাবিলেন—'রাজা ও রাজকুমার দুইজনে ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াই সব সময় ব্যস্ত, রাজকার্য্য একেবারেই

দেখেন না। আর প্রজারা যে দিন দিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, সেদিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। সুতরাং ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজকার্য্যের উত্তম ব্যবস্থা করা উচিত।' এইরূপ পরামর্শের পর তাঁহারা অনেক সৈন্য লইয়া হঠাৎ রাজবাড়ীর চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিলেন।

ইহা দেখিয়া যুবরাজ জীমূতবাহন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন—'বাবা! জ্ঞাতিগণ রাজবাড়ী ঘিরিয়াছেন। আমাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। আপনি হুকুম দিন—আমি এখনই যুদ্ধ করিয়া সকলকে বিনাশ করি।' জীমূতকেতু বলিলেন—'দেখ বাবা! মানুষের জীবন আজ আছে কাল নাই! সামান্য রাজ্যের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ বধ করিলে মহা পাপ হইবে! পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিয়া পরে সেজন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব, যুদ্ধ না করিয়া চল কোন নির্জ্জন জায়গায় গিয়া দেবতার আরাধনা করি।' এইরূপ স্থির করিয়া পিতাপুত্রে রাজধানী ছাড়িয়া মলয় পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে এক মুনি-বালকের সহিত রাজপুত্র জীমূতবাহনের বন্ধুতা হইল। একদিন দুই বন্ধুতে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। নিকটে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের নিকট গেলে সুমধুর বীণার শব্দ শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের বড়ই কৌতূহল হইল! তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, পরমাসুন্দরী এক কন্যা বীণার সাহায্যে গান করিয়া কাত্যায়নী দেবীর উপাসনা করিতেছে। আরাধনা শেষ হইলে পর সাধু জীমূতবাহনের উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া কন্যার বড়ই ভাল লাগিল এবং সখীদ্বারা তাঁহার পরিচয় লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই রমণী ছিল রাজা মলয়কেতুর কন্যা। গৃহে ফিরিয়া আসিলে পর রাজকুমারীর সখী রাণীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। রাণীও রাজা মলয়কেতুকে জীমূতবাহনের কথা জানাইলেন। তখন মলয়-

কেতু রাজপুত্র মিত্রাবসুকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমার ভগিনীর বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এখন তাহার জন্য পাত্রের সন্ধান করা উচিত। আমি শুনিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ জীমূতকেতু নাকি রাজ্য ছাড়িয়া পুত্র জীমূতবাহনের সহিত মলয় পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন। আমার ইচ্ছা জীমূতবাহনকেই জামাতা করি। অতএব, তুমি জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে আমার এই প্রস্তাব জানাও।'

যুবরাজ মিত্রাবসু পিতার আজ্ঞায় জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিলে তিনি তখনই সম্মত হইলেন; এবং জীমূতবাহনকে মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়কেতুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তারপর শুভলগ্নে রাজকুমারী মলয়বতীর সহিত জীমূতবাহনের বিবাহ হইয়া গেল। বরকন্যা পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন জীমূতবাহন শ্যালক মিত্রাবসুর সহিত মলয় পর্ব্বতের নীচে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পর্ব্বতের উত্তর দিকে গিয়া দূরে কতকগুলি ধপ্‌ধপে সাদা জিনিস দেখিতে পাইয়া জীমূত-বাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঐ যে সাদা জিনিসগুলি দেখা যাইতেছে, ওগুলি কি?' মিত্রাবসু বলিলেন—'অনেক দিন পূর্ব্বে গরুড়ের সহিত নাগকুলের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে শেষে নাগেরাই হারিয়া যায়। তখন তাহারা সন্ধি করিতে চাহিলে গরুড় বলিয়াছিলেন—'তোমরা যদি আমার আহারের জন্য, প্রতিদিন একটি করিয়া সাপ দিতে পার, তবে আমি সন্ধি করিব। আর তাহা না হইলে সমস্ত নাগ বধ করিব।' নাগেরা নিরুপায় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইল। সেই হইতে প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় একটি করিয়া নাগ ঐখানে আসে, আর গরুড় তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেই সকল সাপের হাড় জমিয়া সাদা পর্ব্বতের মত দেখা যাইতেছে।

একথা শুনিয়া জীমূতবাহনের বড় দয়া হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'দুই প্রহর বেলা ত প্রায় হইয়া আসিল, নিশ্চয়ই এখনই একটি সাপ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আজ আমার প্রাণ দিয়া

আমি তাহাকে রক্ষা করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কৌশলক্রমে মিত্রাবসুকে বিদায় দিয়া সেই রাশীকৃত হাড়ের নিকট উপস্থিত হইলে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন—এক বৃদ্ধা সাপিনী শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তুমি এমন কাতর হইয়া কাঁদিতেছ কেন?' নাগিনী গরুড়ের বিষয় বর্ণন করিয়া বলিল—'আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। খানিক পরেই গরুড় আসিয়া তাহাকে খাইবে। আমার এই একটি মাত্র পুত্র! তাহার দুঃখেই আমি কাঁদিতেছি।' জীমূতবাহন বলিলেন—'মা! তুমি আর কাঁদিও না। আমি আমার প্রাণ দিয়া আজ তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব।' নাগিনী বলিল—'বাছা! তুমি কেন পরের জন্য নিজের প্রাণ দিবে? আর পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া যদি নিজের পুত্রকে বাঁচাই, তবে যে আমার নরকেও স্থান হইবে না!'

এই সময়ে শঙ্খচূড়ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তখন সে জীমূতবাহনের অভিপ্রায় জানিয়া এবং তাহার পরিচয় লইয়া বলিল—'সে কি মহারাজ! আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? আমার মত কত শত শত জীব জন্মিতেছে আর মরিতেছে। কিন্তু আপনার মত ধার্ম্মিক ও দয়ালু লোক খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। আমার বদলে আপনি মরিবেন—ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; আপনি বাঁচিয়া থাকিলে জগতের কত উপকার হইবে। কিন্তু আমাদ্বারা কোনদিন কাহারও উপকার হইবে না। আমার মত সামান্য লোকের বাঁচা মরা দুই সমান।'

ইহা শুনিয়া জীমূতবাহন বলিলেন, 'শুন শঙ্খচূড়! আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব। আমি ক্ষত্রিয়; জান ত ক্ষত্রিয়েরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চাইতে মৃত্যুকে সামান্য মনে করে। অতএব আর মিথ্যা বাক্যব্যয়ের দরকার নাই—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও।' এই বলিয়া তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়া গরুড়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। মলয় পর্ব্বতের নিকটেই কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। নিরুপায় শঙ্খচূড় নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সেই

মন্দিরে গিয়া প্রাণদাতা জীমূতবাহনের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। যথাসময়ে গরুড় আসিয়া ঠোঁট দিয়া জীমূতবাহনকে লইয়া আকাশে উড়িলেন এবং মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে জীমূতবাহনের হাতের কেয়ূর রক্তমাখা হইয়া মলয়বতীর সম্মুখে পড়িল। উহা দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া মলয়বতী মনে করিলেন—স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার শব্দে রাজা, রাণী, রাজপুত্র সকলে আসিয়া উপস্থিত। তখন রাজকুমারীর কথা শুনিয়া রাজা মলয়কেতু চারিদিকে লোক পাঠাইলেন এবং নিজেও পুত্র মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে বাহির হইলেন।

এদিকে শঙ্খচূড় কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে থাকিয়া যখন রাজবাড়ীর কোলাহল শুনিল, তখন সন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে জীমূতবাহনের বিপদ হইয়াছে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বস্থানে গিয়া গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—'হে বিহঙ্গরাজ! তুমি শঙ্খচূড় মনে করিয়া রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ। আমার নাম শঙ্খচূড়—আজ আমার পালা। তুমি উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে খাও। নতুবা তোমার পাপ হইবে।'

ইহা শুনিয়া গরুড়ের মনে বড় ভয় হইল। তিনি মৃতপ্রায় জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে সাধুপুরুষ! তুমি কে? প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ কেন?' জীমূতবাহন পরিচয় দিয়া বলিলেন—'বিনতানন্দন! প্রাণটা অতি তুচ্ছ, আজ আছে কাল নাই! এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়া যদি পরের উপকার করিতে পারি, তবে ত আমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিব। এই ভাবিয়াই আমি নিজে প্রাণ দিয়া শঙ্খচূড়কে বাঁচাইতে আসিয়াছি।'

জীমূতবাহনের কথা শুনিয়া গরুড় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'জগতে প্রাণীমাত্রেই নিজের প্রাণ

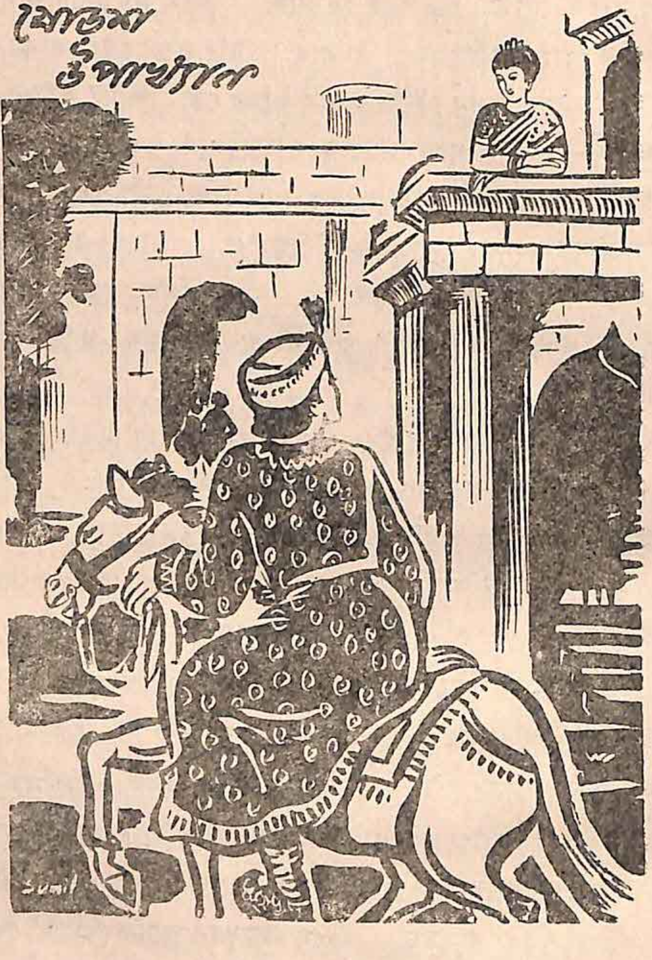
রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়া অন্যের প্রাণ বাঁচায়, এরূপ লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন কি বর চাও বল।' তখন জীমূতবাহন বলিলেন—'খগরাজ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে এই বর দাও যে—এখন হইতে আর নাগদের কোন অনিষ্ট করিবে না। আর এতদিন যতগুলি সাপ খাইয়াছ, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দাও।'

গরুড় তখনই অমৃত আনিয়া মৃত সাপগুলিকে জীবিত করিলেন। তারপর জীমূতবাহনকে বলিলেন—'রাজপুত্র! আমার বরে তোমার পিতার রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে।' এই বলিয়া গরুড় অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্খচূড়ও উপকারী জীমূতবাহনের অনেক স্তুতি করিয়া বিদায় হইল।

গরুড়ের নিকট বর পাইয়া জীমূতবাহন পিতার নিকট গেলেন। তাঁহার উদ্ধারের সংবাদ শ্বশুরবাড়ীতেও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহাদের দুষ্ট জ্ঞাতিগণ গরুড়ের বরদানের কথা শুনিয়া ভয়ে রাজা জীমূতকেতুর নিকটে আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। তারপর অনেক স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজা করিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল বলিল—"মহারাজ! জীমূতবাহন আর শঙ্খচূড়—এই দুইজনের মধ্যে কাহার মহত্ত্ব বেশী?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"শঙ্খচূড়ের।"—"কেন?" রাজা বলিলেন—"জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ দেওয়াটাকে অতি তুচ্ছ মনে করে। সুতরাং শঙ্খচূড়ের জন্য প্রাণ দেওয়াটা জীমূতবাহনের পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু শঙ্খচূড় প্রথমে জীমূতবাহনের প্রাণ দেওয়া বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। পরে নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলেও কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়া উপকারীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিল। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রাণদানে উদ্যত হইয়া জীমূতবাহনকে বাঁচাইল। সুতরাং আমার মতে শঙ্খচূড়েরই মহত্ত্ব বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



বেতাল বলিল—"মহারাজ! চন্দ্রশেখরনগরবাসী বণিক্ রত্নদত্তের পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম উন্মাদিনী। কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে রত্নদত্ত সেই দেশের রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ! আমার এক পরম রূপবতী কন্যা আছে; আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করুন। নতুবা, অন্য পাত্রের সন্ধান করিব।'

উন্মাদিনীর রূপ ও গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা তিনজন প্রাচীন কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ রত্নদত্তের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন—উন্মাদিনীর সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় ইন্দ্রের অপ্সরাও অতি তুচ্ছ। আর তাহার সমস্ত লক্ষণগুলিই উত্তম। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা রাণী হইলে সর্ব্বনাশ হইবে! রাজা ইঁহার বশ হইয়া রাজকার্য্য একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন! সুতরাং রাজার নিকটে বলিব—'কন্যা নিতান্ত কুৎসিত ও কুলক্ষণা।' তারপর রাজার নিকটে গিয়া তাঁহারা সত্য সত্যই কন্যার এইরূপ নিন্দা করিলে তিনি সে কথা বিশ্বাস করিয়া উন্মাদিনীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রবর্ম্মার সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

ইহার পর একদিন রাজা বেড়াইতে বেড়াইতে সেনাপতির বাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে উন্মাদিনী সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং উন্মনা হইয়া তখনই রাজ-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজাকে হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহার অদ্ভূত অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ! আপনাকে এরূপ অস্থির দেখিতেছি কেন? এত শীঘ্র ফিরিয়াই বা কেন আসিলেন?' রাজা বলিলেন—'বেড়াইতে গিয়া বলভদ্রের বাড়ীতে এমন অনিন্দ্যসুন্দরী এক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি যে তাহার কথা আর কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।'

কর্ম্মচারী বলিল—'মহারাজ! যাহাকে দেখিয়াছেন সে রত্নদত্ত বণিকের কন্যা উন্মাদিনী। আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে।' একথা শুনিয়া রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'বটে! তবে ত দেখিতেছি যাহাদিগকে আমি কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম,

তাহারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছে!' রাজা তখনই সেই লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—'রত্নদত্তের কন্যাকে আজ আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার মত সুন্দরী ও সুলক্ষণা স্ত্রীলোক জন্মেও কখনও দেখি নাই। তবে কেন তোমরা তাহাকে কুৎসিত ও কুলক্ষণা বলিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে?'

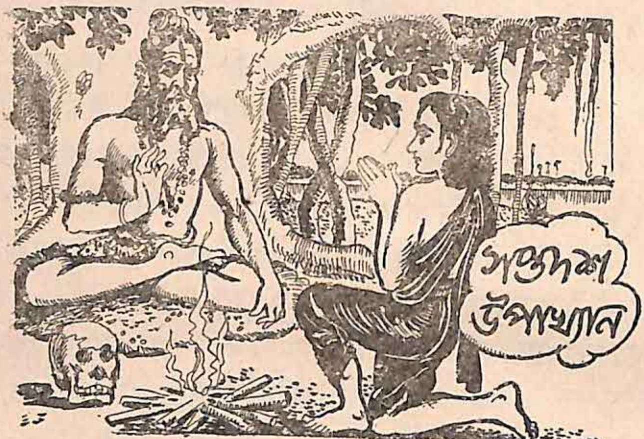
রাজপুরুষেরা হাতযোড় করিয়া বলিলেন—'মহারাজ! আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম—এরূপ সুন্দরী কন্যা রাণী হইলে আপনি রাজকার্য্য ছাড়িয়া রাতদিন অন্তঃপুরেই পড়িয়া থাকিবেন এবং তাহাতে রাজ্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। এই জন্য আমরা তখন কন্যার নিন্দা করিয়াছিলাম। মহারাজ! আমাদের অপরাধ অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।' রাজা কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তখন হইতেই তিনি দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাজার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িল এবং দশম দিনে এই দারুণ মনস্তাপে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই দুঃসংবাদ শুনিয়া প্রভুভক্ত বলভদ্র ভাবিলেন—'এমন গুনবান্ প্রভুই যদি মারা গেলেন, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? বলিতে গেলে আমার জন্যই প্রভুর মৃত্যু হইল। অতএব আত্মহত্যা করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।' এই ভাবিয়া বলভদ্র শ্মশানে গিয়া চিতা প্রস্তুত করাইলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে তিনি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন—'প্রভু, জন্মে জন্মে যেন রাজার মত এইরূপ ধাম্মিক প্রভু পাই।' এই প্রার্থনা করিয়া বলভদ্র জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী উন্মাদিনী ভাবিল—'স্বামীই যখন মারা গেলেন, তখন বিধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আমার লাভ কি? বরং স্বামীর সহগমন করিলে পুণ্য হইবে।' এই ভাবিয়া উন্মাদিনীও বলভদ্রের চিতায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি এই তিন জনের মধ্যে কাহার মহত্ত্ব বেশী?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"প্রভুর জন্য ভক্ত সেবকের প্রাণ দেওয়া স্বাভাবিক—সুতরাং বলভদ্রের বিশেষ কোন বাহাদুরী হয় নাই। উন্মাদিনীরই বা কিসের মহত্ত্ব? সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহগমন করিয়াই থাকে। কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলেই রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্মাদিনীকে রাণী করিতে পারিতেন। তবু তিনি অধর্ম্মের ভয়ে সে কাজ করিলেন না। অথচ এই দুঃখেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সুতরাং আমার মতে রাজার মহত্ত্বই সকলের চেয়ে বেশী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



বেতাল বলিল—"মহারাজ ! বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তিনি হেমকূটনগরে বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র বড় হইলে জুয়া খেলিয়া পিতার সমস্ত ধনসম্পত্তি উড়াইয়া দিল। তারপর আরম্ভ করিল চুরি। তখন তাহার পিতা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

গুণাকর নানা দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া এক নগরে গিয়া দেখিল—এক সন্ন্যাসী শ্মশানে বসিয়া যোগসাধন করিতেছেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সে তাঁহার নিকটে বসিল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমকে দেখিয়া মনে হইতেছে তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে—কিছু খাইবে কি ?' গুণাকর বলিল—'আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু প্রসাদ দিলে নিশ্চয়ই খাইব।' এ কথায় সন্ন্যাসী মড়ার মাথায় করিয়া কিছু খাদ্য তাহার সম্মুখে রাখিয়া খাইতে বলিলে সে বলিল—'মহাশয়! এ খাদ্য আহার করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।'

তখন যোগী চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিবামাত্র এক যক্ষকন্যা তাঁহার

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—'প্রভু! দাসী উপস্থিত—কি করিতে হইবে বলুন।' যোগী বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণকুমার ক্ষুধার্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, তুমি আদর যত্ন করিয়া ইহার সৎকার কর।' আজ্ঞামাত্র যক্ষকন্যা মায়াবলে চক্ষের নিমেষে এক অতি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে সেখানে লইয়া গেল। তারপর মাছ, মাংস, দৈ, দুধ, পায়স প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া সোনার খাটে শুইতে দিল এবং সমস্ত রাত্রি খাটের পাশে বসিয়া তাহার চরণ-সেবা করিল। গুণাকর পরম সুখে রাত্রিযাপন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে গুণাকর দেখিল কোথায় বা সেই যক্ষকন্যা আর কোথায় বা সেই অট্টালিকা! তখন নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন—'যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার বলে আসিয়াছিল। যে যোগবিদ্যায় সিদ্ধ, তাহার নিকটেই সে চিরকাল থাকে। তুমি ত আর যোগী নও, কাজেই সে আমার হুকুম পালন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।' একথা শুনিয়া গুণাকর যোড়হস্তে বলিল—'মহাশয়! দয়া করিয়া আমাকে যোগবিদ্যা শিখাইয়া দিন।' যোগী তাহার স্তুতি মিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—'তুমি ক্রমাগত চল্লিশ দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক গলা জলে নামিয়া এই মন্ত্রের সাধন কর।'

গুণাকর সন্ন্যাসীর উপদেশ মত মন্ত্র জপ করিয়া চল্লিশ দিন পরে তাঁহাকে গিয়া বলিল—'মহাশয়! ঠিক আপনার উপদেশমত চল্লিশ দিন মন্ত্র জপ করিয়াছি। এখন আর কি করিতে হইবে বলুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন—'আর চল্লিশ দিন আগুনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্র জপ কর, তবেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।' তখন গুণাকর বলিল—'মহাশয়! অনেকদিন যাবৎ বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, মা বাবাকে দেখিবার জন্য মন বড় অস্থির হইয়াছে। একবার গিয়া তাঁহাদিগকে

দেখিয়া আসি, পরে আপনার উপদেশ মত সাধন করিব।' এই বলিয়া গুণাকর যোগীর নিকট বিদায় লইয়া দেশে যাত্রা করিল।

দেশে গিয়া যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতা-মাতার আহ্লাদের সীমা রাহল না। অনেক দিন পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে পাইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহারা কত কাঁদিলেন! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'এতদিন কোথায় ছিলে বাছা? তোমাকে না দেখিয়া আমরা যে মৃতপ্রায় হইয়া আছি।' গুণাকর যোগীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল—'অনেক দিন তোমাদিগকে না দেখিয়া মন বড় অস্থির হইয়াছিল, তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি। এখন জন্মের মত বিদায় লইয়া আবার মন্ত্রসাধন করিতে যাইব।'

গুণাকরের কথা শুনিয়া তাহার পিতা-মাতা বলিলেন—'বাবা! তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, এখনও তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। এখন কি যোগসাধন করিবার সময়? ঘরে থাক, আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন না হয় আমাদের কাছে থাক। তারপর ইচ্ছামত যোগসাধন করিতে যাইও।'

পিতা-মাতার কথায় গুণাকর হাসিয়া বলিল—'এই সংসারটা সবই মিথ্যা। কে কাহার মা, কে কাহার বাবা, আর কেই বা কাহার পুত্র?—সকলই ফাঁকি! আমি এই মিথ্যা মায়ায় আর ভুলিব না, যাহা উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিব।' এই বলিয়া গুণাকর পিতা-মাতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু, তারপর সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া তাঁহার উপদেশ-মত আগুনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রসাধন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, ব্রাহ্মণকুমার এত সাধন করিয়াও কেন ফল পাইল না?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যোগসাধনে একান্ত নিষ্ঠার দরকার; ব্রাহ্মণকুমারের মনে সেটা ছিল না বলিয়াই সে অকৃতকার্য্য হইল।" ইহা শুনিয়া বেতাল বলিল—"যে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিল,

তাহার মনে নিষ্ঠা ছিল না —এ কথা কি করিয়া বলিলে?” রাজা বলিলেন—“ব্রাহ্মণকুমারের মনে যদি তেমন নিষ্ঠাই থাকিবে, তবে সে মা-বাবাকে দেখিবার জন্য এতটা অস্থির হইবে কেন? আর, যোগ শেষ না করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেই বা যাইবে কেন? সুতরাং তাহার মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না এবং সে-জন্যই তাহার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।”

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—



অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! কুবলয়পুরে অতি ধনবান্ এক বণিক্ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ধনপতি। ঐ বণিকের কন্যার নাম ছিল ধনবতী। গৌরীদত্ত নামে এক বণিকের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত তাহার নাম রাখিলেন মোহিনী। মোহিনী শৈশবেই পিতৃহীন হইলে তাহার দুষ্ট আত্মীয়-স্বজনেরা বিধবা ধনবতীর সমস্ত চুরি করিয়া নিল। বেচারী ধনবতী নিতান্ত বিপদে পড়িয়া অন্ধকার রাত্রিতে কন্যার সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিল।

কিছুদূর গেলে পর অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ধনবতী এক শ্মশানে গিয়া উপস্থিত। সেই শ্মশানে এক চোরকে তিনদিন যাবৎ শূলে দেওয়া হইয়াছিল এবং তখন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় নাই। অন্ধকারে চলিবার সময় ঘটনাক্রমে ধনবতীর হাত চোরের পায়ে লাগাতে সে ব্যথা পাইয়া বলিল—'একেই ত আমি শূলের যন্ত্রণায় অস্থির আছি, তাহার উপর তুমি কে আসিয়া আবার আমাকে কষ্ট দিলে?' ধনবতী বলিল—'বাছা! আমি না জানিয়া তোমাকে যন্ত্রণা দিয়াছি; আমার

অপরাধ ক্ষমা কর।' তারপর নিজের পরিচয় দিয়া ধনবতী পুনরায় বলিল—'তুমি কে? কি অপরাধে তোমাকে শূলে দেওয়া হইয়াছে?'

চোর বলিল—'আমি একজন বণিক্। চুরির অপরাধে আমাকে শূলে দেওয়া হইয়াছে। তিন দিন যাবৎ শূলেই রহিয়াছি; তবু আমার প্রাণ বাহির হইতেছে না! সেজন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। আমার জন্মের সময় জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু হইবে না। এখন তুমি যদি দয়া করিয়া আমাকে কন্যাদান কর, তবেই আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার শেষ হইবে। যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে এতকাল চুরি করিয়া যে রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিয়াছি, সে সমস্ত ধন তোমাকে দিব।'

ধনবতী টাকার লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই চোরের কথায় সম্মত হইয়া বলিল—'আচ্ছা, তেমোকে কন্যাদান করিব। কিন্তু পৌত্রের মুখ দেখিবার আমার বড় সাধ; তোমাকে কন্যাদান করিলে আমার সে সাধ কি পূর্ণ হইবে?' চোর বলিল—'এখন আমার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, আমার যাতনা দূর কর। আর আমি অনুমতি দিতেছি—তোমার কন্যা বড় হইলে পরে অন্য কোন বণিক্পুত্র:কে ধনের লোভে সম্মত করিয়া তাহার সহিত পুনরায় তাহার বিবাহ দিও। তাহা হইলেই তোমারও পৌত্রের মুখ দেখা হইবে, আর আমারও যাতনা দূর হইবে! কিন্তু মনে রাখিও—মোহিনীর যে পুত্র জন্মিবে সে আমার।'

ইহার পর ধনবতী চোরের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। তখন চোর বলিল—'ঐ যে সম্মুখে গ্রাম দেখিতেছ, তাহার পশ্চিমে আমার বাড়ি। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটা কুয়ার পাশে একটা বটগাছ দেখিতে পাইবে। সেই বটগাছের তলায় মাটির নীচে আমার সমস্ত ধন পুঁতিয়া রাখিয়াছি—সেই ধন তুলিয়া লইয়া যাও।' এই কথা বলিবামাত্র তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। ধনবতীও চোরের উপদেশ-মত সেই বট-গাছের তলায় গিয়া সমস্ত ধন লইয়া পিতার নিকট চলিয়া গেল।

ধনবতীর পিতা কন্যার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাকে পরম যত্নের সহিত লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মোহিনী বড় হইল ; তাহার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল। তখন ধনপতি টাকার লোভ দেখাইয়া অনেক চেষ্টায় এক গরীব বণিক্-পুত্রের সহিত মোহিনীর বিবাহ দিলেন। মোহিনীর স্বামী কিছুকাল তাহার সহিত বাস করিয়া পরে একদিন টাকা-কড়ি লইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে মোহিনীর একটি পুত্র জন্মিল। জন্মের পর ষষ্ঠীর দিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল—পরণে বাঘছাল, শরীরে ভস্মমাখা, হাতে ত্রিশূল, পাঁচটি মাথা আর প্রত্যেক মাথায় তিনটি চোখ—এইরূপ অদ্ভুত আকৃতির এক পুরুষ বলদে চড়িয়া আসিয়া তাহাকে বলিলেন—'বাছা মোহিনী! তোমার এই পুত্র সামান্য নহে তুমি ইহাকে এক সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রার সহিত একটি পেঁটরায় বন্ধ করিয়া কাল রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহাকে আপন পুত্রের মত পালন করিবেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তোমার পুত্র তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া নিজের ক্ষমতায় সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইবে।' এই স্বপ্ন দেখিয়া মোহিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন স্বপ্নের কথা মাকে বলিলে তাহার মা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; এবং পর-দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঐ শিশুকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার সহিত পেঁটরায় বন্ধ করিয়া রাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া আসিলেন। ঠিক সেই সময়ে রাজাও স্বপ্ন দেখিলেন—ঐরূপ এক আশ্চর্য্য পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'মহারাজ! উঠ, দরজায় গিয়া দেখ একটি পেঁটরার মধ্যে উত্তম লক্ষণযুক্ত এক শিশু রহিয়াছে। শীঘ্র তাহাকে আনিয়া আপন পুত্রের মত পালন কর। এই শিশুই কালে তোমার উত্তরাধিকারী হইবে!'

রাজার ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি রাণীকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। পরে দুইজনে দরজায় গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই একটি

পেঁটরা পড়িয়া আছে। তখন মহা সন্তুষ্ট হইয়া পেঁটরার মুখ খুলিবামাত্র দেখিলেন—তাহার মধ্যে বাস্তবিকই একটি শিশু রহিয়াছে—তাহার রূপে চারিদিক্ যেন আলো হইয়া উঠিয়াছে। রাণী শিশুটিকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। রাজাও সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহার পিছন পিছন গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রাজা রাজ্যের জ্যোতিষিগণকে ডাকাইয়া বালকের লক্ষণ পরীক্ষা করিতে বলিলেন। পণ্ডিতগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'মহারাজ! শাস্ত্রে পুরুষের বত্রিশটি উত্তম লক্ষণ লেখা আছে। আমরা দেখিতেছি, সেই সমস্ত লক্ষণই বালকের মধ্যে বর্ত্তমান। সুতরাং এই শিশু যে কালে পৃথিবীর রাজা হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া শিশুকে পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। তাহার নাম রাখিলেন—হরদত্ত। বড় হইয়া হরদত্ত রূপে, গুণে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় হইলেন। পরে রাজার মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসনে বসিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বশ হইল।

কিছুদিন পরে রাজা হরদত্ত তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পিতার শ্রাদ্ধের জন্য গয়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফল্গুনদীর তীরে শ্রাদ্ধ করিয়া যখন পিণ্ড দিবেন, তখন নদীর মধ্য হইতে পিণ্ড লইবার জন্য একসঙ্গে তিনখানি হাত বাহির হইল। প্রথম—চোরের, দ্বিতীয়—সেই নিরুদ্দিষ্ট গরীব বণিকের, আর তৃতীয়—রাজার।"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি এই তিন জনের মধ্যে শাস্ত্র ও যুক্তিমতে কে হরদত্তের পিণ্ড লইবার অধিকারী?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"চোর।" বেতাল বলিল—"কেন মহারাজ? অন্য দুইজনের কি অপরাধ?" রাজা বলিলেন—"চোর ধনবতীকে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল যে মোহিনীর দ্বিতীয়বার বিবাহের পর যে পুত্র জন্মিবে সে পুত্র তাহার হইবে।

তারপর, নিরুদ্দিষ্ট বণিক্ শুধু অর্থের লোভে মোহিনীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই সে সমস্ত ধন চুরি করিয়া পলায়ন করে—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কোন কর্ত্তব্য সে পালন করে নাই। সুতরাং পিতা হইয়াও পুত্রের পিণ্ড লইবার তাহার অধিকার নাই। আর রাজাও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন মাত্র; সেজন্য তিনিও পিণ্ড পাইতে পারেন না। অতএব, আমার মতে চোরই পিণ্ড লইবার অধিকারী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

———



উনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! চিত্রকূটনগরে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম রূপদত্ত। একদিন তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে গেলেন। বনে বনে শিকারের সন্ধান করিয়া শেষে এক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। পরিশ্রান্ত রাজা সেখানে একটি সুন্দর পুকুর দেখিয়া নিকটেই একটি গাছে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নান করিবার জন্য পুকুরের জলে নামিল। কন্যার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা অবাক্ হইয়া গেলেন। পরে স্নান শেষ করিয়া কন্যা যখন আশ্রমের দিকে ফিরিয়া চলিল, তখন রাজা তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন—'কন্যা! তোমার

এ কি রকম ব্যবহার? আমি বিশ্রামের জন্য তোমার আশ্রমে আসিলাম, আর তুমি কি না আমার সঙ্গে একটিও কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছ?' এই কথা শুনিয়া কন্যা দাঁড়াইল।

ঠিক এই সময়ে কন্যার পিতাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক!' এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া রাজার মনে দুষ্ট অভিপ্রায় জাগিল। তিনি বলিলেন—'ঠাকুর! শুনিয়াছি মুনি-ঋষিদের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া আপনি যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে আশা পূর্ণ হইবার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না? মুনিঠাকুর বলিলেন—'আমি যখন বলিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।' তখন রাজা নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিলেন—'আমি আপনার এই কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।'

রাজার এই দুরভিসন্ধি জানিয়া ঋষি মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও নিজের কথা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। বিবাহের পর মুনিঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া রাজা কন্যার সহিত রাজধানীর দিকে ফিরিলেন। আসিতে আসিতে পথে রাত্রি হইলে ফলমূল দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া দুইজনে গাছেরতলায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় অতি বিকটাকার একটা রাক্ষস আসিয়া রাজাকে জাগাইয়া বলিল—'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার স্ত্রীকে আমি খাইব!' রাজা জোড়হস্তে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার স্ত্রীকে বধ করিও না; আর যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব।' তখন রাক্ষস বলিল—'তুমি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের হাতে বার বছরের ব্রাহ্মণকুমারের মাথা কাটিয়া আমাকে দিতে পার, তবে তোমার স্ত্রীকে ছাড়িতে পারি।' রাণীকে বাঁচাইবার জন্য রাজা ব্রহ্মবধে সম্মত হইয়া বলিলেন—'তুমি আজ

হইতে সপ্তম দিনে আমার রাজধানীতে যাইও, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।'

এইরূপে রাজাকে ব্রহ্মহত্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাক্ষস চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজাও রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে আসিয়াই তিনি প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া রাক্ষসের কথা বলিলে মন্ত্রী বলিলেন—'মহারাজ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যবস্থা করিয়া দিব।' মন্ত্রীর কথায় ভরসা পাইয়া রাজা রাণীকে লইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে বুদ্ধিমান মন্ত্রী করিলেন কি, সোনার এক পুতুল প্রস্তুত করাইয়া সেটাকে মূল্যবান্ অলঙ্কার পরাইলেন। তারপর সেটাকে নগরের চৌরাস্তায় রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—'যে ব্রাহ্মণ নিজের বার বছরের পুত্রকে বলির জন্য দিতে পারিবেন, তিনিই এই মহামূল্য সোনার পুতুল পাইবেন।' নিতান্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের বার বৎসরের এক পুত্র ছিল। তিনি মন্ত্রীর ঘোষণা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণি। আর ত দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য হয় না! এ পর্য্যন্ত তোমাকে শুধু কষ্টই দিলাম, একদিনের জন্যও আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এই এক সুযোগ উপস্থিত। তোমার যদি মত হয়, তবে পুত্রকে দিয়া এই সোনার পুতুল লইয়া আসি। তাহা হইলে বাকি জীবনটা পরম সুখে কাটাইতে পারিব।'

ব্রাহ্মণী মত দিলেন; ব্রাহ্মণও পুত্রকে দিয়া সোনার পুতুল লইয়া আসিলেন। তারপর সপ্তম দিনে সেই রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ব্রাহ্মণকুমারকে আনিয়া রাজায় হাতে এক ধারাল খড়গ দিয়া তাহার মাথা কাটিতে বলিলেন। রাজা তাহার মাথা কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিলে সে মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিল এবং পরক্ষণেই রাজা তাহার মাথা কাটিয়া রাক্ষসের হাতে দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! মরিবার

সময় সকলেই কাঁদিয়া থাকে ; কিন্তু বল দেখি ব্রাহ্মণবালক হাসিল কেন ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"ব্রাহ্মণকুমার ভাবিয়াছিল—'হায় ! শিশুকালে পিতামাতাই লালন-পালন করেন, আর দেখেন শুনেন। তারপর বড় হইলে যদি কোন বিপদ আপদ হয়, তবে রাজা রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার দুই দিকই নষ্ট হইল। পিতা-মাতা অর্থের লোভে আমাকে বিক্রয় করিলেন। আর রাজা নিজেই আমার মাথা কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন !' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকুমার অশ্রদ্ধাভরে হাসিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—



বিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে অতিশয় ধনবান্ এক বণিক্ ছিলেন। তাঁহার পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার নাম অনঙ্গমঞ্জরী। কন্যা বড় হইলে অর্থদত্ত, মদনদাস নামক এক বণিক্‌পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী শিশুকাল হইতেই বিশালপুর নগরের এক বণিক্‌পুত্রকে ভালবাসিত; বণিক্‌পুত্রও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক ছিল। অর্থদত্ত কিম্বা তাঁহার পত্নী কেহই সে-কথা জানিতেন না। বিবাহের পূর্ব্বে অনঙ্গমঞ্জরীও লজ্জায় পিতামাতাকে সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে নাই। যাহা হউক, বিবাহের পর সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া নিষ্ঠার সহিত ঘর-সংসার করিতে লাগিল। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও সেই বণিক্‌পুত্রের কথা সে ভুলিতে পারিল না; তাহার জন্য সে প্রতিদিনই গোপনে চক্ষের জল ফেলিত। কিছুদিন পরেই মদনদাস স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাত্রা করিল।

অনঙ্গমঞ্জরীর অত্যন্ত প্রিয় এক সখী ছিল; সে তাহার মনের

দুঃখ জানিত। একদিন দুইজনে বসিয়া গল্প করিতে করিতে হঠাৎ জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল—সেই বণিক্‌যুবক যাইতেছে। অনঙ্গমঞ্জরী যে বাপের বাড়ী আসিয়াছে, সে-কথা বণিক্‌পুত্র জানিত। তাই সে অর্থদত্তের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কেমন যেন একটু আন্‌মনা হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে অনঙ্গমঞ্জরীও হঠাৎ তাহাকে দেখিয়াই এক চীৎকার দিয়া একেবারে অজ্ঞান! তখন সখী ভাবিল—'বণিক্‌পুত্রকে ডাকিয়া আনি, একবার দেখা করিয়া ইহারা শেষ বিদায় লউক।' এই ভাবিয়া, সখী তখনই গিয়া বণিক্‌পুত্রকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আসিয়া দেখিল—কি সর্ব্বনাশ! অনঙ্গমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করিয়াছে! ইহা দেখিয়া বণিক্‌পুত্রও—'হায় কি হইল' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল।

তখন বাড়ীময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনঙ্গমঞ্জরীর পিতা, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া সখীর নিকট সব কথা শুনিলেন এবং অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর দুইজনকে শ্মশানে নিয়া একসঙ্গে এক চিতায় আগুন দিলেন। এদিকে ঘটনাক্রমে মদনদাসও ঠিক্ সেই সময়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত শ্মশানে গিয়া সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিল এবং দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি ইহাদের মধ্যে কাহার ভালবাসা বেশী?" রাজা বলিলেন—"মদন-দাসের।"—"কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"অনঙ্গমঞ্জরী আর সেই যুবক শৈশব হইতে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত। সুতরাং তাহাদের শোক ও মৃত্যুতে বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু মদনদাস—অনঙ্গমঞ্জরী অন্য লোককে ভালবাসিত একথা জানিতে পারিয়াও—তাহার শোকে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিল—ইহা কি সাধারণ ভাল-বাসার কথা?"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! জয়স্থলনগরে বিষ্ণুস্বামী নামে পরমধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র; চার জনই অপদার্থের একশেষ। বড়টি পাশা খেলিয়া দিন কাটাইত; মধ্যমটি ছিল দুশ্চরিত্র; তৃতীয়টি নির্লজ্জ; আর চতুর্থ পুত্রটি ছিল ঘোর নাস্তিক। পুত্রদের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেন। একদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'যে ব্যক্তি দ্যূত-ক্রীড়ায় সময় নষ্ট করে, শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহার নাক কান কাটিয়া গাধায় চড়াইয়া তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে। রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলিয়া রাজ্য হারাইলেন, স্ত্রী হারাইলেন—শেষে বনে গিয়া তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর, যে দুশ্চরিত্র সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে চোর হয়। তাহার আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সবই নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে উপদেশ দেওয়া কিংবা তিরস্কার করা বৃথা। সে নিতান্ত জঘন্য কাজ করিলেও লজ্জা বোধ

করে না। আর, যাহার কোন ধর্ম্ম নাই, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই সংসারে লোকে চিরকালই পুত্রের মঙ্গলকামনা করে। কিন্তু, তোমাদের মত হতভাগ্য পুত্রদের পক্ষে আমি মৃত্যুই উচিত মনে করি।' পিতার তিরস্কার শুনিয়া চার পুত্রের মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে লেখাপড়া না শিখার দরুণই তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা। তখন তাহারা স্থির করিল, 'বিদেশে গিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিব।' এই স্থির করিয়া তাহারা নানা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা রকম বিদ্যা শিখিল।

একজন শিখিল অস্থিসজ্ঘটনী বিদ্যা—সে মৃত জন্তুর হাড় পর পর একত্র জোড়া লাগাইতে পারে। অন্য একজন শিখিল মাংস-সঞ্জননী বিদ্যা—মৃত জন্তুর কঙ্কালে সে মাংস লাগাইয়া দিতে পারে। তৃতীয় জন শিখিল চর্ম্মযোজনী বিদ্যা—মাংসের উপর সে চামড়া জুড়িয়া দিতে পারে। আর চতুর্থ জন শিখিল মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা—মৃতদেহে সে প্রাণ দান করে।

চারিজনে এই চারি রকমের বিদ্যা শিখিয়া দেশে ফিরিবার পথে দেখিল—এক স্থানে কতকগুলি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদের মধ্যে যে অস্থিসজ্ঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে হাড়গুলি পরস্পর জোড়া লাগাইল। যে মাংস দিবার বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে সেই কঙ্কালে মাংস লাগাইল। তারপর, যে চামড়া লাগাইবার বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে সমস্ত শরীরটা চামড়া দিয়া ঢাকিলে দেখা গেল, সেটা একটা বাঘের শরীর হইয়াছে। তখন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার বলে চতুর্থ সেই শরীরে প্রাণ দিবামাত্র, ব্যাঘ্র জীবিত হইয়া চারিজনকে বধ করিল।"

এই গল্প বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, ইহাদের মধ্যে কে বেশী নির্ব্বোধ?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"যে প্রাণ দান করিল, সেই সকলের চেয়ে বেশী নির্ব্বোধ।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—



দ্বাবিংশ উপাখ্যান

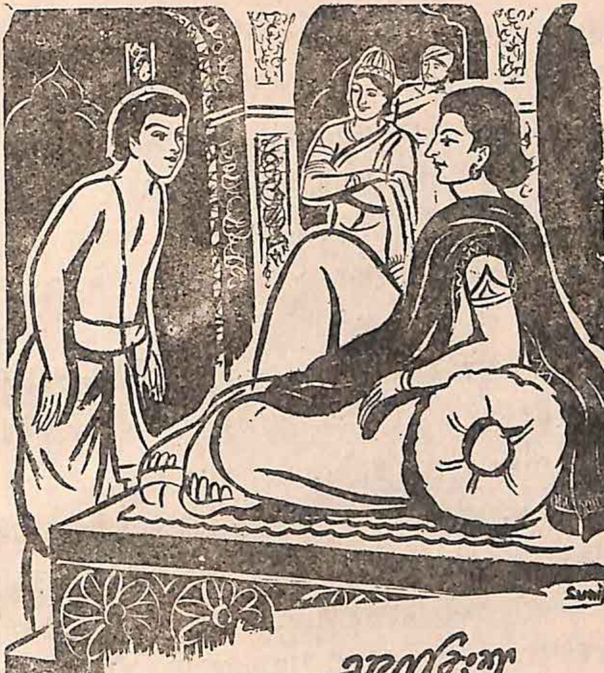
বেতাল বলিল—"মহারাজ ! বিষ্ণুপুরনগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ তিনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন—'এখন বুড়া হইয়াছি, শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তবুও দেখিতেছি, সংসারের সুখভোগের ইচ্ছাটা একটুও কমে নাই ! আমি অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানি। অতএব, আমার এই জরাজীর্ণ রুগ্ণ ও দুর্ব্বল শরীর ছাড়িয়া কোন যুবকের শরীরে প্রবেশ করিব। তাহা হইলে আরও কিছুকাল সংসারে সুখভোগ করিতে পারিব। কিন্তু হঠাৎ নিজের শরীর ছাড়িয়া অন্যের শরীরে ঢুকিলে, আমার উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারিবে। সুতরাং এক কাজ করি—যোগসাধন করিব বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া বনে যাই। তারপর সুবিধা পাইলেই উদ্দেশ্য সফল করিব।'

এইরূপ স্থির করিয়া নারায়ণ যোগাভ্যাসের ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনে গেলেন। বনে গিয়া কিছুকাল পরে তিনি সুবিধা-মত এক যুবকের শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষয়সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ! ব্রাহ্মণ নিজের শরীর ছাড়িবার সময় কাঁদিয়া, যুবকের শরীরে প্রবেশ করিবার সময় হাসিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে কাঁদিবার ও পরে হাসিবার কারণ কি?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"বেতাল, পূর্ব্বের শরীর ছাড়িবার সময় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন —হায়, হায়! এতাদনের যত্নের শরীরের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রহিল না! এই দুঃখে ব্রাহ্মণ কাঁদিয়াছিলেন। আর, পরের সুস্থ সবল দেহে ঢুকিয়া বিষয়ভোগের বেশ সুবিধা হইল, এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়াছিলেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—

———



ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—"মহারাজ! ধর্ম্মপুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম গোবিন্দ। তাঁহার দুই পুত্র—ভোজনবিলাসী, আর শয্যাবিলাসী। ভাতে কিংবা ব্যঞ্জনে কোন দোষ থাকিলে অন্য লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে পারা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও ভোজন-বিলাসী সেই অন্ন ও ব্যঞ্জন কিছুতেই আহার করিতে পারিত না। আর, বিছানায় নিতান্ত সামান্য কোন ত্রুটি থাকিলেও, শয্যাবিলাসী সে বিছানায় কিছুতেই শুইতে পারিত না। বাস্তবিক, গোবিন্দের দুই পুত্রের এই এক এক বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ক্রমে, তাহাদিগের এই ক্ষমতার কথা সেই দেশের রাজার কানে গেল। তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদিগের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজনকেই ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

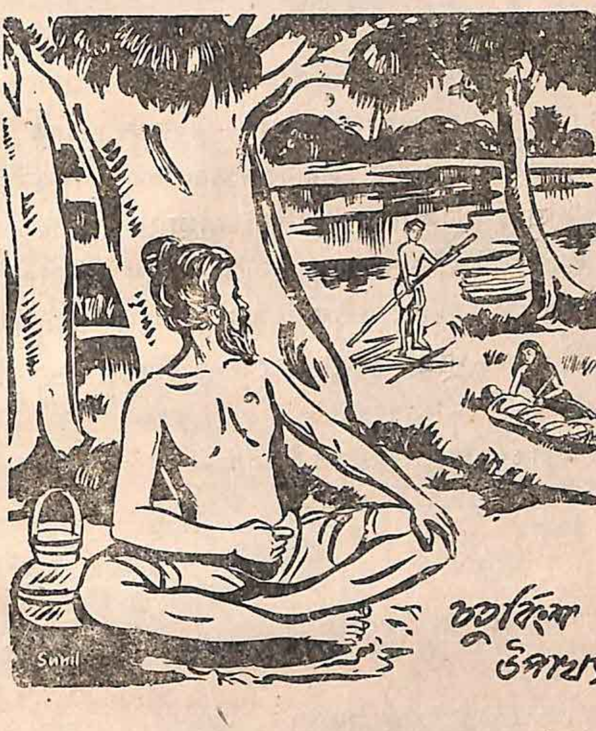
দুইজনে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজা প্রথমে ভোজন-বিলাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাচককে ডাকিয়া নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। খাদ্য প্রস্তুত হইলে, রাজার আদেশে ভোজনবিলাসী রান্নাঘরে গিয়া আহারে বসিল। কিন্তু আসনে বসিবামাত্র উঠিয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন! তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছ ত?' সে বলিল—'মহারাজ! আহার কি করিয়া করিব? যে চালের ভাত রান্না হইয়াছে, সে বোধ করি কোন শ্মশানের নিকটস্থ ক্ষেতের ধানের চাল—তাই ভাতে মড়ার গন্ধ!' এ-কথা শুনিয়া রাজা লোকটাকে পাগল ভাবিয়া হাসিলেন। যাহা হউক, তাহাকে কিছু না বলিয়া একজন চাকরকে সেই চালের সন্ধান লইতে বলিলেন। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! অমুক গ্রামে শ্মশানের নিকটে এক ধানক্ষেত আছে; সেই ক্ষেতের ধানে এই চাল প্রস্তুত হইয়াছিল।' ইহা শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভোজনবিলাসীর অসাধারণ ক্ষমতার অনেক প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর, একটি সুসজ্জিত ঘরে রাজার উপযুক্ত বিছানা প্রস্তুত করাইয়া তিনি শয্যাবিলাসীকে শুইতে বলিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণ শুইয়াই রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! বিছানার সপ্তম গদির তলায় একগাছি চুল পড়িয়া আছে; তাহাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা যারপরনাই আশ্চর্য্য হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন—সত্য সত্যই সপ্তম গদির নীচে একগাছি চুল রহিয়াছে। তখন রাজা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই ভাইকে অনেক পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! এই দুই জনের মধ্যে বেশী প্রশংসা পাইবার যোগ্য কে?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমার মতে শয্যাবিলাসী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি—



চতুর্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল—“মহারাজ! যজ্ঞশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ কলিঙ্গ-দেশে বাস করিতেন। তিনি অনেক তপস্যা করিয়া দেবতার প্রসাদে এক পুত্র পাইয়াছিলেন। পুত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আঠার বৎসর বয়সে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ঐ শ্মশানে এক বৃদ্ধ যোগী অনেকদিন যাবৎ যোগসাধন করিতে-ছিলেন। আঠার বৎসরের ব্রাহ্মণ কুমারের শব দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—‘আমার এই জীর্ণশীর্ণ শরীর এখন কাজের অনুপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই যুবকের শরীরে প্রবেশ করি; তাহা হইলে

আরও অনেক দিন যোগসাধন করিতে পারিব।' এই ভাবিয়াই ঈশ্বরের নাম লইয়া তিনি যুবকের শরীরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমার সেই মুহূর্ত্তেই বাঁচিয়া উঠিল। তখন পুত্রকে জীবিত দেখিয়া যজ্ঞশর্ম্মা প্রথমে হাসিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কাঁদিতে লাগিলেন।"

ইহা বলিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! বল দেখি, যজ্ঞশর্ম্মা প্রথমে হাসিলেন এবং পরে কাঁদিলেন কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া আহ্লাদে যজ্ঞশর্ম্মা প্রথমে হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার বিদ্যা জানিতেন। ঐ বিদ্যার বলে পরক্ষণেই যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ যোগী তাঁহার পুত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীবিত করিয়াছেন, তখন তিনি কাঁদিলেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল প্রতিজ্ঞামত ইত্যাদি—



বেতাল বলিল—“মহারাজ ! দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মপুর নামক নগরে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম মহাবল। তাঁহার অতি বলবান্ শত্রু, অন্য দেশের এক রাজা হঠাৎ একদিন সৈন্য-সামন্তের সহিত আসিয়া তাঁহার রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিলেন। রাজা মহাবল অনেক যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুর সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমেই বিনষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি রাণী ও কন্যার সহিত গভীর বনে পলায়ন করিলেন। রাণী ও রাজকুমারীর পথ চলার অভ্যাস নাই, সুতরাং ক্ষণকাল পরেই তাঁহারা নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদিগকে

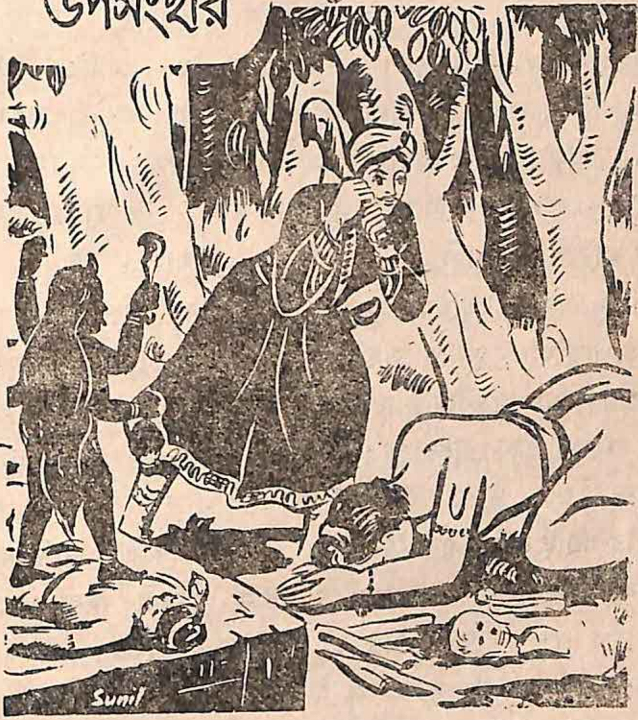
এক গাছের তলায় রাখিয়া, জল ও খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় রাজাকে বাহির হইতে হইলে। এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু রাজা ফিরিলেন না। রাণী ও রাজকন্যা নানা বিপদের আশঙ্কায় অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

ঐ দিন, কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া সেই বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপ ভয়ানক বনে হঠাৎ মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—চিহ্নগুলি স্ত্রীলোকের পায়ের! তখন চন্দ্রসেন বলিলেন—'এই পথে নিশ্চয় দুইজন স্ত্রীলোক গিয়াছে—চল চারিদিক্ খুঁজিয়া দেখি।' পিতা-পুত্রে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই গাছের তলায় গিয়া দেখিলেন—পরমাসুন্দরী দুইটি স্ত্রীলোক নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। তখন অনুসন্ধান দ্বারা সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তাঁহাদিগকে নানা রকমে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়া দুইজনকে তিনি রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে রাজা চন্দ্রসেন বিবাহ করিলেন রাজকুমারীকে এবং যুবরাজ বিবাহ করিলেন রাণীকে।"

গল্প শেষ করিয়া বেতাল প্রশ্ন করিল—"মহারাজ! এখন বল দেখি—ইঁহাদের সন্তান জন্মিলে, পরস্পরের কি সম্বন্ধ হইবে?" প্রশ্ন শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য একটু হাসিলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

———

উপসংহার



(তালবেতাল)

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল মনে মনে ভাবিল—প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া রাজা হাসিলেন। যাহা হউক, দুষ্ট যোগীকে শাস্তি দিয়া বিক্রমাদিত্যের উপকার করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে বলিল— 'মহারাজ! তোমার সাহস ও বুদ্ধি দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমাকে একটু উপদেশ দিতেছি—মন দিয়া শুন। যে যোগী তোমাকে শব লইয়া যাইতে বলিয়াছে, তাহার নাম শান্তশীল—সে জাতিতে কুমার। আর যে শব লইয়া যাইতে

আসিয়াছ—উহা ভোগবতীর রাজা চন্দ্রভানুর শব। শান্তশীল যোগবলে চন্দ্রভানুকে বধ করিয়াছে। এখন তোমাকে মারিতে পারিলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অতএব তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পূজা শেষ হইলে যোগী বলিবে—'মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।' তখন, তুমি যেমন মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিবে, অমনি সে খড়্গ দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। অতএব, যোগীর কথায় প্রণাম না করিয়া তুমি বলিও—'আমি রাজা, কাহাকেও কোনদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নাই। কি করিয়া সেরূপ প্রণাম করিতে হয় জানি না—আপনি তাহা দেখাইয়া দিন্।' তখন তোমাকে প্রণাম দেখাইবার জন্য যোগী দেবীর সম্মুখে লম্বা হইয়া মাটিতে পড়িবে। তুমিও সেই মুহূর্ত্তে খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিও। আর, দেবীর মন্দিরের নিকটেই দেখিবে উনানের উপর ফুটন্ত তেলের কড়া রহিয়াছে। তাহাতে যোগী ও চন্দ্রভানুর শব ফেলিয়া দিও। তাহা হইলেই তালবেতাল লাভ করিয়া তুমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে এবং চিরজীবন সুখে বাস করিতে পারিবে।"

বিক্রমাদিত্যকে এইরূপে সাবধান করিয়া দিয়া, বেতাল চন্দ্রভানুর শব হইতে বাহির হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার পর বিক্রমাদিত্য সেই শব লইয়া যোগীর নিকটে গেলে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিলেন। তারপর পূজা শেষ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, তোমার অশেষ ক্ষমতা হইবে এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে!" তখন বেতালের উপদেশমত রাজা বলিলেন—"প্রভু! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কি করিয়া করিতে হয় জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন।" যোগী প্রণাম দেখাইবার জন্য মাটিতে লম্বা হইয়া পড়িবামাত্র, বিক্রমাদিত্য খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া দেবতারা বিক্রমাদিত্যের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার

সাহস দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।' বিক্রমাদিত্য জোড়হস্তে বলিলেন—"প্রভু! আপনার অনুগ্রহে পৃথিবীতে আমার কিছুরই অভাব নাই। তবে, এই প্রার্থনা করি—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন আমার এই ঘটনা প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।" দেবরাজ ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র চলিয়া গেলে বিক্রমাদিত্য সেই দুই শব ফুটন্ত তেলে ফেলিবামাত্র, তালবেতাল নামে বিকটাকৃতি দুই বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"মহারাজ, কি করিতে হইবে বলুন!" বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"তোমরা এখন চলিয়া যাও। পরে আবশ্যকমত আমি স্মরণ করিলে আমার নিকট আসিও।" এই কথায় সম্মত হইয়া তালবেতাল চলিয়া গেল।

এইরূপে তালবেতালকে লাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য সন্তুষ্টচিত্তে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং অদ্বিতীয় অজেয় রাজা হইয়া সুখে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

কথাসরিৎসাগর

বেতাল পঞ্চবিংশতি

রবিন হুড

পুরাণের গল্প

পড়বার ও উপহার দেবার মত বই

বাঙলার কথা

শ্রীজয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় এম. এ.
এবং অধ্যাপক শ্রীনিশীথ রঞ্জন রায় কর্তৃক
পরিদৃষ্ট ও পরিমার্জিত

ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা

ছোটদের ভ্রমণকাহিনী

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা : অন্ধ্র : মহিসুর : তামিলনাড়ু
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত

প্রকাশক :

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩